প্রেম-মরীচিকা

প্রেম-মরীচিকা

প্রভৃতি

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রণীত

কলিকাতা

১৩১৬।

১১৬।৪, গ্রে ষ্ট্রীট, বসুমতী পুস্তকবিভাগ হইতে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
কলিকাতা,—৬৪।১, ৬৪।২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচী

এই সংগ্রহের অনেকগুলি গল্প "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থকার।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক ।

বিপত্নীক

অধঃপতন

প্রেমের জয়

নাগপাশ

উচ্ছ্বাস

আষাঢ়ে গল্প

রবিনসন ক্রুসো

বঙ্কিমচন্দ্র

প্রেম-মরীচিকা

১

বিশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা মাসিকপত্র সন্ধান করিলে এক জন অধুনা-অজ্ঞাত লেখকের বহু রচনা পাইবে। গদ্যে ও পদ্যে, গল্পে ও কবিতায়, সমালোচনায় ও রহস্য-রচনায় তাহার দুর্লভ ক্ষমতা বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন শক্তি-সঞ্চারের সূচনা করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু অল্প দিনেই বাঙ্গালা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার কার্য্য শেষ হইয়াছিল। তাহার রচনা নানা মাসিকপত্রের পৃষ্ঠাতেই বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,—অল্পদিনেই বিলুপ্ত হইবে; কেহ সে সকল সংগ্রহ করিয়া একত্র প্রকাশ করে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক এই লেখককে লইয়া বিপদে পড়িবেন—ইহার সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা জল্পনা করিয়া শেষে ইহার সাহিত্যিক প্রতিভাকে অতি দীপ্ত বিদ্যুদ্বিকাশের সহিত তুলনা করিবেন। সংসারে কোন্ কারণ হইতে কোন্ কার্য্য হয়, তাহা কয় জন অবগত হইতে পারে? যে প্রেম-মরীচিকা অমূল্যচরণের সাহিত্যিক ক্ষমতা বিকশিত করিয়াছিল, তাহারই সন্ধানের ব্যর্থ শ্রমে,—তাহারই অসারতা-দর্শনে মর্ম্মব্যথায় সে ক্ষমতার বিনাশ হয়।

অমূল্যচরণ আমার বাল্যবন্ধু—সতীর্থ ছিল। বিদ্যালয়ে তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রবল অধ্যয়নস্পৃহা দেখিয়া শিক্ষকগণ বিস্মিত ও প্রীত হইতেন,—অনেক ছাত্র ঈর্ষ্যায় জ্বলিত। সে কখনও কাহারও

হিংসা করে নাই। অধ্যয়নেই সে প্রগাঢ় আনন্দ ও অসাধারণ সুখ পাইত। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণও সমস্যার সমাধানের জন্য তাহার সাহায্যপ্রার্থী হইত। সেই সময় আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হই।

এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাই। অমূল্য বি. এ. পড়িতে থাকে। এই সময় আমাদের উভয়েরই বিবাহ হয়। কবিজনের কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে অমূল্য তাহার পত্নীকে ভালবাসিত। মৃগনাভির মত প্রেম কখনও গোপন থাকে না। অমূল্যচরণের প্রেম তাহার ব্যবহারে সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশ করিত। অমূল্য সে প্রেম গোপন করিতে পারিত না। তাহার সুখে আমি সুখী হইতাম। এমনই ভাবে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। অমূল্য বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। যে বৎসর সে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, সেই বৎসর তাহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

২

অম্লকণাপাতে যেমন পাত্রস্থ দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়, তেমনই ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষজর্জ্জরহৃদয় এক জনের দোষে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুখ ও সুবিধা যাতনায় ও বেদনায় পরিণত হয়। অমূল্যচরণের উপর তাহার দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার বিদ্বেষের কতকগুলি কারণ ছিল :—প্রথমতঃ, সে কনিষ্ঠ বলিয়া গৃহে জননীর ও জ্যেষ্ঠদিগের বিশেষ স্নেহভাজন ; দ্বিতীয়তঃ, সে স্বভাবগুণে সকলের প্রিয় ; তৃতীয়তঃ, তাহার অধ্যয়নসাফল্যে

সকলেই তাহার প্রশংসা করিতেন। স্বামীর উপর বিরক্তি স্ত্রীতেও সংক্রামিত হইয়াছিল; আবার অমূল্যচরণের পত্নীরও তাঁহাদিগের অপ্রিয় হইবার কতকগুলি কারণ ছিল,—তিন বধূর মধ্যে সে-ই রূপে শ্রেষ্ঠা; সকলেই বলে, সে স্বামিসোহাগিনী। কোনও কোনও রমণী অন্যের স্বামিপ্রেমসম্পদ সহ্য করিতে পারে না। ইহার উপর যখন অমূল্যচরণের পুত্র পিতামহীর ও জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের অত্যধিক স্নেহভাজন হইয়া উঠিল, তখন তাহার পত্নীর সৌভাগ্য তাহার ভ্রাতৃজায়াদ্বয়ের একান্তই অসহনীয় হইয়া উঠিল।

মধ্যমা স্বভাবতঃ ভীরু; স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া—স্বীয় উদ্যোগে কোনও কার্য্য করিতে তাঁহার সাহসে কুলায় না। জ্যেষ্ঠা কিন্তু বিপরীত। তিনি সর্ব্বদাই স্বীয় প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে সমুদ্যতা, সকল অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক। এবার তিনি স্বয়ং রমণীর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে কৃতসংকল্পা হইলেন, এবং মধ্যমাকে আপনার ইঙ্গিতে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। যাহাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের সঞ্চার হয়, তাহার চেষ্টা চলিতে লাগিল। অমূল্যচরণের পত্নীর প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা দেখাইবার প্রয়াস যে কেবল তাহার প্রকৃত মনোভাবগোপনের চেষ্টা, অথচ সেই জন্যই সকলে তাহার পত্নীকে লজ্জাহীনা বলে, মাধুরীকে এ কথা নিত্য বুঝান হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যচরণের নানাবিধ নিন্দা চলিতে লাগিল। অমূল্য তাহা জানিত; গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু ক্রমাগত ঐ সব কথা শুনিয়া মাধুরীর মন ক্রমে সন্দেহে আন্দোলিত হইতে

লাগিল। বিশেষতঃ কেহ তাহাকে স্বামিসোহাগিনী বলিলে তাহার বড় জা যখন তাহার প্রতিবাদ করিয়া তাহাকে উপেক্ষিতা, কিন্তু প্রতারিতা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেন, এবং তাহার মেজ জা সেই মতের সমর্থন করিতেন, তখন তাহার দুঃখের আর সীমা থাকিত না।

৩

স্বামীর প্রেমে অটল বিশ্বাস ছিল বলিয়াই মাধুরী স্বামীর অতি-রিক্ত মনোযোগে লোকের উপহাস গ্রাহ্য করিত না। সে বিশ্বাস যত শিথিল হইতে লাগিল—তাহার প্রতি স্বামীর মনোযোগ যতই কৃত্রিম বলিয়া বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল, ততই লোকের মতামতে তাহার আস্থা বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে তাহার কক্ষের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত-কালে অমূল্য প্রত্যেকবার কক্ষমধ্যে আসিয়া তাহার সহিত প্রেমের অর্থহীন—কিন্তু অত্যাবশ্যক—দুই চারিটি কথা না বলিলে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িত,—সে যেন কিছুতেই সুখ পাইত না; এখন অমূল্য পুনঃপুনঃ কক্ষে আসিলে সে লজ্জিতা হইত—লোকে কি বলিবে? সে অনেক সময় শাশুড়ীর কাছে থাকিত।

পত্নীর এইরূপ ব্যবহারে অমূল্য বিশেষ বেদনা পাইত। কাহারও কাহারও বিশ্বাস, সাহিত্যশিল্পী কল্পনাবলে অপ্রকৃত রচনায় ব্যস্ত থাকার ফলে প্রকৃত আবেগ ও উচ্ছ্বাস ও প্রবল বৃত্তি আর তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না; তাঁহার বেদনা, যাতনা, অনুভূতি সবই কল্পিত—সবই কৃত্রিম। এমন ভ্রান্ত বিশ্বাস আর নাই। ভাবের অত্যুক্তিই শিল্প; বাস্তবকে চিত্তাকর্ষক করিতে হইলে তাহাকে প্রবল

ও প্রধান করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। শিল্পীকে কল্পনাবলে সর্ব্বদাই সেই কার্য্য করিতে হয়; তাঁহাকে অনুভূতি তীক্ষ্ণ করিতে হয়। তাহার পর ছুরিকা শাণিত হইলে তাহার সামান্য আঘাতেই অধিকারীর অঙ্গুলী কাটিয়া যায়; তাই শিল্পী সহজেই বেদনা পাইয়া থাকেন। তাঁহার যাতনার তীক্ষ্ণতাও অধিক।

অমূল্যচরণ যাতনা পাইত। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যাতনা তাহার পত্নীর ব্যবহারে। যাহাকে সে জীবন-সর্ব্বস্ব করিয়াছে, সে কেন পরের কথায় বিশ্বাস করে? তাহার প্রেমে কি অটল বিশ্বাস নাই? সে কেন তাহার জন্য আর সব সহ্য করিতে পারে না? তাহার পক্ষে প্রেমই কি অনন্ত সুখ নহে? তাহার হৃদয়ে অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মদ্যপ যেমনে শোকে বা দুঃখে সুরার উত্তেজনায় বেদনা ভুলিবার চেষ্টা করে—সে তেমনই সাহিত্যচর্চ্চায় আপনার যাতনা ভুলিতে চেষ্টা করিল। ব্যর্থ চেষ্টা। কিন্তু তাহার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট গল্প ও কবিতা এই সময়ের রচনা;—সে সকল রচনা তাহার বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগে লিখিত,—হৃদয়শোণিতে রঞ্জিত।

মাধুরী স্বামীকে ভালবাসিত; তাই লোকের বিদ্রূপ, উপহাস তাহার হৃদয়ে কেবল স্বামীর উপর অভিমান উত্তেজিত করিত। কেন তাঁহার জন্য লোকে তাহাকে উপহাস করে? লোকে কেন তাঁহার নিন্দা করে? অমূল্যচরণের ভ্রাতৃজায়াদ্বয়ের অবিরত চেষ্টায় তাহার হৃদয়ে সন্দেহের ছায়াপাত হইয়াছিল। ক্রমাগত সেই চিন্তায় সে ছায়া

গাঢ় হইতে লাগিল। ক্রমে স্বামীর অভিমানজাত অনাদরকে সে তাঁহার প্রকৃতমনোভাববিকাশ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। সেও বিষম বেদনা পাইতে লাগিল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল।

এই সময় মাধুরী পীড়িতা হইল। একদিন এমন ঘটিল যে, অমূল্য তাহাকে ঔষধ সেবন করাইবার চেষ্টা করিলে সে ঔষধ সেবনে অস্বীকৃতা হইল--শেষে অন্যের অনুরোধে ঔষধ পান করিল। অমূল্যচরণের আহত অভিমান তাহাকে বিষম যন্ত্রণা দিল, সে আর আপনার স্বাভাবিক সংযম রক্ষা করিতে পারিল না। স্বামী স্ত্রীতে কথান্তর হইল। শেষে মাধুরী বলিল,—"তোমার নিকট আমার আর কোন আশাই নাই।"

সেই দিনই অমূল্যচরণ গৃহ ত্যাগ করিল—নিরুদ্দেশ হইল। দীর্ঘ তিন বৎসর তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

৪

বহ্নি যেমন বসনে আবৃত করিয়া রাখা যায় না, প্রকৃত প্রতিভা তেমনই অজ্ঞাতবাসের আবরণে গোপন করা যায় না। বিশেষতঃ, প্রতীচ্য সভ্যতার সঙ্গী সংবাদপত্র কোনও ঘটনা ঘটিতে না ঘটিতে দিকে দিকে তাহার সংবাদ ঘোষণা করিয়া দেয়। মাদ্রাজ প্রদেশে সেবার অনাবৃষ্টি হেতু দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু রাজকর্ম্মচারীরা সে কথা স্বীকার করিয়া আবশ্যক ব্যবস্থার বিধান করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। এই সময় মাদ্রাজের একখানি মৃতপ্রায় সংবাদপত্রে নবজীবন সঞ্চারিত হইল ;—কোথায়

লোকের কিরূপ কষ্ট হইয়াছে; অদূর ভবিষ্যতে লোকের কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবার সম্ভাবনা, কি পরিমাণ শস্য মজুদ আছে, পরবর্ত্তী ফসল পর্য্যন্ত কি পরিমাণ শস্য আবশ্যক, কোথায় কোন্ কর্ম্মচারী কিরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন—এ সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ নিত্য তাহাতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই পত্রে দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদিগের দুর্দ্দশার বিবরণ পাঠ করিয়া লোকে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। সে বর্ণনা কবি ব্যতীত অন্যের লেখনীপ্রসূত হইতে পারে না। জন-সাধারণের অনুরোধে সম্পাদক সাহায্য-ভাণ্ডার সংস্থাপিত করিলেন। তাঁহার বর্ণনায় লোকে করুণাবিগলিত হইয়া ভাণ্ডারে অর্থ প্রদান করিতে লাগিল। শেষে এমন দাঁড়াইল যে, সরকারের পক্ষে আর নিশ্চেষ্ট থাকা অসম্ভব হইল। সরকার হইতে সাহায্যদান আরম্ভ হইল। এক জন লোকের চেষ্টায় লক্ষ লক্ষ জীবননাশ নিবারিত হইল। সম্পাদক অমূল্যচরণের নাম আর অজ্ঞাত রহিল না।

দুর্ভিক্ষ শেষ হইল। বর্ষব্যাপী দারুণ শ্রমে অমূল্যচরণের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল। সরকার তাহাকে উপাধি দিয়া সম্মানিত করিতে চাহিলেন—সে উপাধি লইতে অস্বীকার করিল।

এই সময় তাহার সন্ধান পাইয়া তাহার অগ্রজদ্বয় অমূল্যচরণের নিকট গমন করিলেন, এবং তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইলেন। অমূল্য অস্বীকার করিল। তাহার পর তাহার জননী যাইয়া তাহাকে গৃহী করিবার চেষ্টা করিলেন। অমূল্য বলিল, "মা, তোমরা সে চেষ্টা করিলে এবার আমি এমন স্থানে যাইব যে, আর আমার

সন্ধান পাইবে না।” মা অঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

৫

দুর্ভিক্ষদমনের দারুণ শ্রমে অমূল্যচরণের যেরূপ স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতে তাহার পক্ষে চিকিৎসার অপেক্ষাও বিশ্রাম অধিক আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহার ভাগ্যে বিশ্রামলাভ ছিল না। তখন হইতে সকল বৃহৎ অনুষ্ঠানেই তাহাকে নেতা হইতে হইত। সে সে প্রদেশে লোকশিক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। সর্ব্বদা কর্ম্মের কোলাহল তাহার ভাল লাগিত—কার্য্যবাহুল্যে সে হৃদয়ের যন্ত্রণা ভুলিতে চেষ্টা করিত। সমস্ত দিন সংবাদপত্রের ও নানা অনুষ্ঠানের কার্য্য করিয়া রাত্রিতে সে অধ্যয়ন করিতে বসিত ;—নিশীথে যখন নয়ন-সমক্ষে আলোক যেন ম্লান বোধ হইত, তখন কোন দিন যাইয়া শয্যায় শয়ন করিত, কোনও দিন বা সেই আসনেই ঘুমাইয়া পড়িত। অতিরিক্তশ্রমকাতর দেহ তখন কেবল মানসিক তেজে পরিচালিত হইতেছিল। এই অবস্থায় আট মাস কাটিয়া গেল।

এই সময় অমূল্যচরণ আর একটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। সে সময় পুলিসের এক জন প্রধান কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ কানাকানি হইতেছিল। কিন্তু কেহ সাহস করিয়া প্রকাশ্য ভাবে প্রতীকারের কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে সাহসী হইতেছিল না। অত্যাচারীরা নির্ভীক অমূল্যচরণকে বিশেষ ভয় করিত—সে দুষ্টের শাসক ছিল। অমূল্য কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিল।

প্রমাণ সংগৃহীত হইলে সে তাহার দোষোদ্‌ঘাটন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার প্রবন্ধে সেই সব অত্যাচারকাহিনী পাঠ করিয়া লোকে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল; গভর্মেণ্ট বিচলিত হইলেন,—কর্ম্মচারীর কৈফিয়ৎ তলব ও তাহাকে অস্থায়িভাবে পদচ্যুত করিবার আদেশ হইল।

বলা বাহুল্য, কর্ম্মচারীটি অমূল্যচরণের উপর জাতক্রোধ হইল। কিন্তু সে বিশেষ জানিত, প্রমাণ সংগ্রহ না করিয়া অমূল্য কিছু লেখে না,—সব প্রমাণ তাহার হস্তগত। এই সময় একটি সভাপ্রতিষ্ঠার জন্য অমূল্যচরণ দুই দিনের জন্য মফঃস্বলে গেল। সেই অবসরে তাহার কার্য্যালয়ে চুরী হইল; তাহার টেব্‌লের দেরাজ ভাঙ্গিয়া কাগজপত্র অপহৃত হইল। পরদিন কর্ম্মচারীটি অমূল্যচরণের নামে মানহানির নালিশ করিল।

অমূল্যচরণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইল; প্রমাণ করিবার উপায় নাই। ফরিয়াদী উদারতার ভান করিয়া বলিল, মিথ্যা কুৎসাপ্রকাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিবে। কাগজের স্বত্বাধিকারী তাহাই করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। অমূল্য বলিল, যাহা সত্য বলিয়া জানি, তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাহার করিতে পারিব না,—যাহা হয় হউক। বিচারক ব্যাপার বুঝিলেন; কিন্তু প্রমাণ নাই, সুতরাং তিনি নিরুপায়। আদালতের বিচারে ফরিয়াদীর মানের দাম পাঁচ শত টাকা স্থির হইল। অমূল্যচরণের সামান্য সঞ্চয় মোকদ্দমা চালাইতে ফুরাইয়া আসিয়াছিল। অনেকে জরিমানার টাকা

দিতে উদ্যত হইলে সে কিছুতেই লইল না; আপনার পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া টাকা দিল। সংবাদপত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ শেষ হইল। তখন তাহার আর্থিক অবস্থা যেমন শোচনীয়, তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থাও তেমনই ভীতিজনক।

কয় দিন পরে মাদ্রাজের কয় জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অমূল্যচরণের সাহায্যার্থ ধনভাণ্ডার-সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া সংবাদপত্রে পত্র লিখিলেন। আমি তখন গাজিপুরে ডাক্তার। আমি এক শত টাকা পাঠাইয়া দিলাম। শুনিয়াছি, দুই তিন দিনের মধ্যেই ভাণ্ডারে দশ সহস্র টাকা আসিয়াছিল। অমূল্যকে লোকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিত, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়।

আমার প্রেরিত টাকা ফিরিয়া আসিল। অমূল্য সাহায্য গ্রহণ করিবে না। সে সংবাদপত্রে পত্র লিখিল, যে সকল বন্ধু তাহার জন্য চিন্তিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, সে তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁহারা তাহার অজ্ঞাতে ও অনভিমতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। জানিতে পারিলে সে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিত। সমস্ত জীবন ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধবাদ প্রচার করিয়া সে এখন জীবনের অবসানকালে ভিক্ষা লইতে অসম্মত। তাই সে প্রেরিত অর্থ ধন্যবাদ সহ প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছে।

৬

আমি মাদ্রাজ যাত্রা করিলাম।

মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে চক্ষুর জল রাখিতে পারিলাম না। সমুদ্রতীরে একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইয়া অমূল্যচরণ বাস করিতেছে। তাহার দেহ অস্থিচর্ম্মসার; কিন্তু মানসিক তেজ তখনও অনাহত। তখনও সে সমাগত জনগণকে নানারূপ উপদেশ দিতেছে; উৎসাহে আপনি আপনার ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা ভুলিয়া যাইতেছে।

আমি অন্যান্য কথার পর তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইবার প্রস্তাব করিলাম। অমূল্য বলিল,—"ও কথা বলিও না। দাদারা অনেকবার পত্র লিখিয়াছেন; হয় ত এক জন আসিবেন। আমি যাইব না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এ অবস্থায় তোমাকে একক এই স্থানে থাকিতেও দিব না।"

অমূল্য বলিল, "ভাই, মা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে লইতে আসিয়াছিলেন; তখন মা'কে বলিয়াছিলাম, সে চেষ্টা করিলে এমন স্থানে যাইব যে, আর আমার সন্ধানও পাইবে না।"

আমি বলিলাম, "ভারতবর্ষে কোথায় তুমি আত্মগোপন করিতে পারিবে?"

আমরা যে কক্ষে বসিয়াছিলাম, সে কক্ষের মুক্তবাতায়নপথে মধ্যাহ্নরবিকরদীপ্ত, শ্বেত-ফেনচূড় তরঙ্গে আন্দোলিত সমুদ্রের ঘন-নীল জল দেখা যাইতেছিল। অমূল্য সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

অমূল্যচরণের মত মানসিকবলশালী ব্যক্তি যখন এমন কথা মনে করিতে পারে, তখন সত্য সত্যই ভীত হইবার কথা।

আমার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। আমি অমূল্য-চরণের শীর্ণ কর ধারণ করিয়া ডাকিলাম,—"অমূল্য!"

অমূল্য বিচলিত হইল; গদ্গদকণ্ঠে উত্তর দিল,—"ভাই!"

আমি বলিলাম, "আমার গৃহে চল।"

অনেক বুঝাইবার পর অমূল্য সম্মত হইল।

পরদিন আমি অমূল্যচরণকে লইয়া যাত্রা করিলাম। তাহাকে বিদায় দিবার জন্য ষ্টেশনে বিপুল জনতা সমাগত হইল।

মান্দ্রাজ ত্যাগ করিতে অমূল্য অশ্রুবর্ষণ করিল। এই তাহার কর্ম্মক্ষেত্র। এই স্থানেই তাহার বিপুল শক্তি কর্ম্মসাধনায় ব্যয়িত হইয়াছে; এই স্থানেই সে কর্ম্মকোলাহলে আপনার ব্যথিত হৃদয়ের বিষম বেদনা ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছে।

৭

গাজিপুরে আমার গৃহপ্রাঙ্গনে গাড়ী প্রবেশ করিল। তখন শীতবাতে আমার উদ্যানে গোলাপগাছগুলি ফুলভারে নত হইয়া পড়িতেছে। অমূল্যচরণ সতৃষ্ণনয়নে সে দৃশ্য দেখিল, উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিল, "এ স্থানে মরিতে কি সুখ!" সে বুঝিয়াছিল, তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।

গাজিপুরে আমার বাসার বারান্দায় বসিয়া অমূল্যচরণ উদ্যান-শোভা দেখিত,—আর কি ভাবিত। মলিনতা তাহার সরল হৃদয়

স্পর্শ করে নাই। সে আমার কন্যাদ্বয়কে লইয়া খেলা করিত। আমি বুঝিতে পারিতাম, সে অসুখী। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ কি কখনও সুখী হইতে পারে? যে বিপুল শ্রম করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই, কর্ম্মাক্ষমতাই তাহার বিষম যন্ত্রণা। অমূল্য সেই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল।

তাহার মনোভাব বুঝিয়া আমি তাহার জ্যেষ্ঠকে আসিতে নিষেধ করিলাম।

আমি অমূল্যচরণের চিকিৎসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু চিকিৎসক শারীরিক ব্যাধির ঔষধ দিতে পারে,—মানসিক ব্যাধির ভেষজ তাহার নাই। মানসিক ব্যাধি অমূল্যচরণের শারীরিক দৌর্ব্বল্য বৰ্দ্ধিত করিতে লাগিল। অল্প দিনেই আমি বুঝিলাম, রোগ চিকিৎসার অতীত।

দ্বিতীয় মাসে অমূল্যচরণ শয্যা লইল। সে হাসিমুখে রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিল। তাহার সহিষ্ণুতায় আমি—চিকিৎসক বিস্মিত হইলাম। তাহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল—জীবনীশক্তির হ্রাস হইতে লাগিল।

শেষে এমন দাঁড়াইল যে, দুর্ব্বল হৃদয়ের ক্রিয়া যখন তখন বন্ধ হইতে পারে; মৃত্যু আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইল। আমি গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিলাম,—একবার তাহার বাটীর সকলকে আনিবার কথা বলা আবশ্যক। আমি যাইয়া তাহাকে সে কথা বলিলাম। তাহার কোটরগত নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ব্যস্ত হইয়া

মস্তক সঞ্চালন করিল,—না। সে বলিল, “মনে করিও, আমার কেহ নাই।” সে তখন এমনই দুর্ব্বল যে, সেই শিরঃসঞ্চালনের শ্রমে হাঁপাইতে লাগিল। আমি উত্তেজক ঔষধ প্রদান করিলাম।

তাহার উত্তর শুনিবার জন্য আমার গৃহিণী উৎকণ্ঠিতা ছিলেন। আমি তাঁহাকে তাহা জানাইলাম। শুনিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, “তুমি ভুল করিয়াছ। ফিরিয়া যাইয়া পুত্রকে দেখিতে চাহেন কি না, জিজ্ঞাসা কর।”

আমি যাইয়া সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। অমূল্য উত্তর দিল না, কেবল তাহার দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

আমি অমূল্যচরণের পত্নীকে ও পুত্রকে লইয়া আসিবার জন্য তাহার অগ্রজদ্বয়কে টেলিগ্রাম করিলাম। উত্তর পাইলাম,—তাহার পুত্র দুই মাস পূর্ব্বে লোকান্তরিত হইয়াছে; তাহার পত্নীকে লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ রওনা হইলেন।

পরদিন অমূল্যচরণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। তাহার দ্রব্যাদির মধ্যে একটি ছোট হাণ্ডব্যাগ ছিল। সে শয্যাত্যাগে অসমর্থ হইয়া সেটিকে আপনার শয্যাপার্শ্বস্থ ঔষধাদি রক্ষার জন্য সংস্থাপিত টেব্‌লে আনাইয়াছিল। কিন্তু কোন দিন সেটি খুলিয়া দেখে নাই। আজ সে ব্যাগটি শয্যায় রাখিতে বলিল। আমি তাহাই করিলাম।

রোগীর অবস্থা বিবেচনায় আমি সে দিন তাহার সহিত তাহার স্ত্রীকে বা জ্যেষ্ঠকে সাক্ষাৎ করিতে দিলাম না।

৮

সে রাত্রিও কাটিল। পর দিন প্রভাত হইতে অমূল্যচরণের সংজ্ঞা লুপ্ত হইল। সমস্ত দিনে কয়বার মাত্র মেঘাচ্ছন্ন অমানিশায় বিদ্যুদ্বিকাশের মত তাহার জ্ঞানবিকাশ হইল। কিন্তু সে জ্ঞানবিকাশ একান্তই অল্পকালস্থায়ী। একবার সে আমাকে বলিল, "ভাই, তোমাকে বড় বিরক্ত করিলাম।"

যথনই জ্ঞান হইতে লাগিল, সে তথনই সেই হাতব্যাগটিকে নিকটে টানিয়া লইতে লাগিল।

দিন গেল,—রাত্রি আসিল। আমি ও আমার কয় জন বন্ধু অমূল্যচরণের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার জীবনের অবসান আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। আমি চিকিৎসাব্যবসায়ী,—কতবার কত রোগীর অন্তিম দশা দেখিয়াছি। কিন্তু আমিও বুক বাঁধিতে পারিতেছিলাম না। অমূল্য আমার সোদরোপম বন্ধু; তাহার মৃত্যুতে এক জন কর্ম্মবীরের তিরোভাব হইতেছিল।

মধ্যরাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পর অমূল্যর দেহ ক্রমে শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। রোগীর আননে যাতনার চিহ্নমাত্র নাই,—মুখে স্নিগ্ধ প্রশান্তি। ধীরে ধীরে জীবনস্রোত শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। যখন রজনী প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন সব ফুরাইল।

আমি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিলাম। পার্শ্বের কক্ষে আমার পত্নী ছিলেন। আমি সে কক্ষে যাইতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সব শেষ!"

আমি নিরুত্তর হইলাম। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। অমূল্য-চরণের পত্নী পার্শ্বস্থ কক্ষে ছিলেন। আমার পত্নী অশ্রুবিজড়িতস্বরে বলিলেন, "দারুণ উদ্বেগে ও রাত্রিজাগরণে অভাগিনী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শেষ দেখা না দেখাইয়া লইয়া যাইও না।" তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

আমি স্বহস্তে অমূল্যচরণের শেষ শয্যা কুসুমে সজ্জিত করিলাম। তাহার পর আমরা মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া চলিলাম। সে জীবনের শেষ সময় যে ব্যাগটি নিকটে টানিয়া লইয়াছিল, তাহাতে তাহার প্রিয়তম সামগ্রী আছে বুঝিয়া আমি তাহার শবদেহের সহিত তাহা ভস্মীভূত করিতে ইচ্ছা করিলাম,—ব্যাগটি সঙ্গে লইলাম।

শ্মশানে চিতায় অগ্নিসংযোগের সময় আমি ব্যাগটি খুলিলাম। তাহাতে তাহার পত্নীর একখানি ফটো ব্যতীত আর কিছুই ছিল না! হায় প্রেম—হায় প্রেম-মরীচিকা!

আশা-হত।

১

পোষ্যপুত্র যেমন জনককে ত্যাগ করিয়া অল্প দিনেই পালকের আপনার হইয়া পড়ে, প্রমথনাথের পিতা তেমনই কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় থাকিয়া দেশ ছাড়িয়া কলিকাতারই হইয়া পড়িয়াছিলেন। একমাত্র সন্তান প্রমথনাথকে রাখিয়া তাঁহার পত্নী যখন পরলোকগতা হইয়াছিলেন তখন যে তাঁহার বিবাহ করিবার বয়স গিয়াছিল—এমন নহে। কিন্তু তিনি আর বিবাহ করেন নাই; কলিকাতায় একখানি বাড়ী কিনিয়া বসিয়া পুত্রকে 'মানুষ' করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েন। দেশের বাড়ীটির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না বলিয়াই বোধ হয় গ্রামের আর সকলের সেটির প্রতি লোলুপদৃষ্টি ছিল। তাহারা আবশ্যক মত সেই গৃহ হইতে আপনাদের গৃহের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল; শেষে যাহা অবশিষ্ট ছিল, স্বেচ্ছাবর্দ্ধনশীল লতাগুল্ম আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

প্রমথনাথের বয়স যখন বাইশ বৎসর তখন গ্রীষ্মকালে একদিন আদালত হইতে ফিরিবার সময় গাড়ীতেই তাহার পিতার সর্দ্দিগর্ম্মি হয়। গাড়ী যখন বাড়ী আসিল, তখন রোগীর বাক্‌রোধ হইয়াছে। তাড়াতাড়ি চিকিৎসক ডাকা হইল। কিছুতেই কিছু হইল না। অল্পক্ষণ যাতনা ভোগের পর রোগীর সলিলস্তম্ভিত দৃষ্টি পুত্রের মুখের উপর আসিয়া স্থির হইল। প্রমথনাথ পিতৃহীন হইল।

আশা-হত।

প্রমথনাথের পিতার মৃত্যুর পর পিতার কন্যাদায়গ্রস্ত বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিতান্ত আত্মীয়ভাবে তাহার বিবাহ করিবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। বিবাহ করিবার কথাটা সেই প্রথম প্রমথনাথের মাথায় উঠিল। কিন্তু সে বিষয়ে তাহার বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইল না।

২

প্রমথনাথের পিতা বেশ গুছাইয়া গিয়াছিলেন; অর্থাৎ পুত্রকে নিষ্কর্ম্মা থাকিবার যথেষ্ট সুবিধা দিয়া গিয়াছিলেন। পুত্রও সে সুবিধা অবহেলা করা যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই।

কবিতা রোগটা প্রমথনাথের বাল্যসঙ্গী। তবে পিতার ভয়ে তরুণ কবিকে অনেকদিন পর্য্যন্ত কবিতা লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইয়াছিল। ইহাতে দুইটা উপকার হইয়াছিল—প্রথমতঃ, পাঠক-সম্প্রদায়কে তাহার 'ছেলেখেলা' পড়িবার যন্ত্রণা পাইতে হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ, কলমের গাছের মুকুল প্রথম দুই একবার ভাঙ্গিয়া দিলে যেমন পরে পরিপুষ্ট মিষ্ট ফল পাওয়া যায় তেমনই সে তাহার প্রথম উদ্যমের রচনাগুলি নষ্ট করায় তাহার শেষের রচনার পাক অতি মিষ্ট ও মধুর হইয়া আসিয়াছিল।

এখন প্রমথনাথ কতকগুলি গীতি-কবিতা একত্র করিয়া প্রকাশ করিল। যুবকের কবিতা—সুতরাং বলা বাহুল্য—প্রেমঘটিত। সংবাদ-পত্রের সমালোচকগণ কেহ কেহ মুরুব্বির চালে বলিলেন, রচনা বিশেষ আশাপ্রদ, চর্চ্চা রাখিলে লেখক কালে সুকবি হইতে পারি-

বেন। প্রমথনাথ প্রথমেই উপাদেয় উপহার লইয়া আসিয়াছিল। পাঠক সমাজে বোদ্ধার অভাব নাই; তাঁহারা বলিলেন, অতি অল্প লেখকই এমন জিনিস লইয়া প্রথম আসরে দেখা দেন।

এই সময় একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক প্রমথনাথের বাটীর ঠিক পার্শ্বের বাড়ী ভাড়া লইলেন। তাঁহার যুবক পুত্রদিগের সহিত অল্প দিনেই প্রমথনাথের পরিচয় হইল। পরিচয় ক্রমে সৌহার্দ্দ্যে পরিণত হইল। প্রমথনাথ দেখিল, কবিতাটা তাহাদের পরিবারের রোগ,—তাহারা সকলেই অল্প বিস্তর কবি। কবিতা ও সমালোচনা উভয়ই তাহাদের অভ্যস্ত ছিল। বিদেশী কবিদিগের আলোচনায় ও সমালোচনায় তাহাদের সঙ্গে প্রমথনাথের দিন বেশ কাটিত।

তাহারা মধ্যে মধ্যে বলিত, শুনিয়াছি, কেহ কেহ মরিবার ভয়ে এতই ভীত হইয়া পড়ে যে, সেই ভয়েই মরিয়া শেষে নিষ্কৃতি লাভ করে। আমরা বাড়ীতে আপনার প্রশংসার জ্বালায় অস্থির হইয়া আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়া তবে উদ্ধার লাভ করি। আপনার অনেক কবিতাই শৈলের কণ্ঠস্থ। সে কবির চিড়িয়াখানায় আপনাকে সিংহ প্রমাণিত না করিয়া ছাড়িবে না।

শৈলবালা তাহাদের ভগিনী। সে বিদ্যালয়ে অনেকদূর অগ্রসর হইবার পর তাহার পিতা জিদ করিয়া তাহাকে বিদ্যালয় ছাড়াইয়াছিলেন। প্রমথনাথ প্রায়ই দেখিতে পাইত, সে ছাতে টবে গাছে আধ-ফোটা ফুলটি ফুঁ দিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে, বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে গ্রন্থ পাঠ করিতেছে, বা রং মিলাইয়া পশম বুনিতেছে। তাহার

চলন এমন নিঃসঙ্কোচ, তাহার ব্যবহার এমন রমণীসুলভ, তাহার ভাব এমন নির্ভীক, তাহার ভঙ্গী এমন মধুর যে বোধ হইত, যেন তাহাতে জলভরা মেঘ আর চঞ্চল বিদ্যুৎ একত্র সমাবেশে পরস্পরকে আরও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। লাবণ্যের ও সরলতায় সমাবেশ তাহাকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশ্রীতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে সৌন্দর্য্যশ্রী প্রমথনাথের নিকট প্রথম-সাগরযাত্রায় যাত্রীর নয়নে শ্যামায়মান তটশোভার মত রমণীয় বোধ হইত। তাহা তাহার নিকট যেমন নূতন—তেমনই মনোহর।

৩

ক্রমে শৈলবালার সহিত প্রমথনাথের পরিচয় হইল। পরিচয়ের ফলে প্রমথনাথ বুঝিল যে, কেবল দূরত্বের কুহেলিকাই শৈলকে বিচিত্রবর্ণচ্ছটায় শোভাময়ী করিয়া তুলে নাই। তাহার ব্যবহার এক দিকে যেমন নিঃশঙ্কোচ, অপর দিকে তেমনই গম্ভীর। সে অনায়াসে প্রমথনাথের সহিত নানা বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইত—কবিতার আলোচনা করিত, উপন্যাসের নায়কনায়িকা-চরিত্রের বিশ্লেষণ করিত, রচনা প্রণালীর সমালোচনা করিত, কিন্তু উচ্ছ্বসিত আবেগেও এমন ব্যবহার করিত না, এমন কথা কহিত না—যাহাতে ঘনিষ্ঠতার ইতর বিশেষ হয়। তাহার ব্যবহার প্রমথনাথকে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানের সীমারেখায় আনিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে সে সামান্য ব্যবধানটকু অতিক্রম করিতে সাহসী করে নাই। সে আপনার আচরণে আপনার প্রতি সম্মান অটুট রাখিত।

ক্রমে এমনই দাঁড়াইল যে, একটা নূতন কবিতার রচনা করিলেই প্রমথনাথ খাতাখানি হাতে করিয়া শৈলবালাকে শুনাইতে যাইত। শৈল কবিতা শুনিত, আর নিঃসঙ্কোচে সমালোচনা করিত:—এটুকু সুন্দর হইয়াছে, এ স্থানটা কষ্টকল্পনাদুষ্ট, এ উপমাটি চমৎকার, এ মিলটা কাণে লাগিতেছে, এ ভাবটি নূতন, এ কথা পুরাতন—বিশেষ বার্ণস্ যেমন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—তেমন করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

এই ভক্ত সমালোচকের প্রভাবে প্রমথনাথের হৃদয়ের যাহাই হউক, কবিতার যে বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই সময়ে বিবাহের কথা হইলেই প্রমথনাথের মানসপটে শৈলবালার মুখ ফুটিয়া উঠিত; সে মনে করিত—অমনটি হইলে বিবাহ করা যায়। ফুল যেমন ধীরে ধীরে ফলে পরিণত হয়, তেমনই কবে যে এই 'অমনটি'—'ঐটি'তে পরিণত হইয়াছিল, প্রথমে প্রমথনাথ আপনিই তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে আপনি যখন তাহা বুঝিতে পারিল তখনও আপনার নিকট স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত—ভয়, পাছে বাস্তবের মেঘমুক্ত গগনে কল্পনার ইন্দ্রধনু বিলুপ্ত হয়—জাগরণে সুপ্তির স্বপ্ন নিতান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে।

৪

এক দিন প্রভাতে শৈলবালাকে গোটা দুই নূতন কবিতা শুনাইতে যাইয়া প্রমথনাথ দেখিল, তাহার দুই ভ্রাতার সহিত শৈলবালার

বিষম তর্ক বাধিয়াছে ; বিষয়—প্রতিভা। কোন পক্ষই কোন পক্ষের কোন কথা মানিয়া লইবে না ; সুতরাং তর্কের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা অল্প। বহুক্ষণ তর্কের পর শৈল বলিল, "তোমরা যাহাই বল, আমি বলি, যাহারা ইট কাঠের ঘরে বাস করে, দিন গুজরাণ করে—তাহাদের গঠনে ও প্রতিভাশালীদিগের গঠনে কোন পার্থক্য আছে কি না সন্দেহ। দুই দলে জগতের সাধারণ বৈষম্যেরই মত সামান্য প্রভেদ থাকিতে পারে ; কিন্তু কথা এই যে, প্রতিভার যে বীজ মানব-হৃদয়ে নিহিত থাকে সময়, সুবিধা ও চেষ্টার ফলে তাহা বিকশিত হয়। কেবল সময়, সুবিধা ও চেষ্টার অভাবেই অনেক সময় 'সাধারণ লোক' প্রতিভাশালী হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।"

এক ভ্রাতা বলিলেন, "ধর—এই প্রমথ বাবু। তুমি কি মনে কর যে, কেবল সময়, সুবিধা ও চেষ্টার অভাবেই আমি প্রমথ বাবুর মত কবিতা লিখিতে পারিতেছি না ? আমাদের দু'জনে কি কোন বিশেষ প্রভেদ নাই ?"

শৈল বলিল, "সামান্য প্রভেদ থাকিতে পারে। বিশেষ প্রভেদ আছে কি না সন্দেহ। আমার কথা, প্রমথ বাবু এখন সময়, সুবিধা ও চেষ্টার ফলে যেরূপ কবিতা লিখিতে পারিতেছেন, তোমার পক্ষেও সেই তিনের সমন্বয়ে সেইরূপ কবিতা রচনা অসম্ভব নাও হইতে পারে। সে তিনের সেরূপ সম্মিলন ব্যতীত তাঁহার পক্ষেও সেরূপ রচনা সম্ভব হইত না। প্রমথ বাবু কি ইহা স্বীকার করেন না ?"

প্রমথনাথ বলিল, "করি।"

"আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে বলুন, আপনার কবিতার উৎস কোথায়; সে উৎসমুখ কিরূপে বাধামুক্ত হইল? তাহা হইলেই আমি দাদাকে আমার কথা বুঝাইয়া দিতে পারিব।"

কথাটা শৈলবালা যেমন সহজ ভাবে বলিল, প্রমথনাথ সেরূপ সহজ ভাবে লইতে পারিল না। সে কথায় তাহার পক্ষে একটা সম্ভাবনার পথ মুক্ত হইয়া গেল।

তখন বেলা হইয়াছে। "কথাটা একটু ভাবিয়া বলা আবশ্যক। আমি পরে বলিব।"—বলিয়া প্রমথনাথ শৈলবালাকে কবিতার খাতাখানা দিয়া গমনোদ্যত হইল। শৈল বলিল, "যদি কথাটা প্রকাশ করিতে আপনার কিছুমাত্র আপত্তি থাকে, তবে কায নাই।"

৫

সমস্ত মধ্যাহ্নটা প্রমথনাথ চিঠির কাগজ সম্মুখে রাখিয়া মাথা চুলকাইল; কিরূপ লিখিলে ভাল হয়,—ভাবটি ব্যক্ত হয়, অথচ শিষ্টাচারের সীমা অনতিক্রান্ত থাকে? শেষে অনেক ভাবিয়া—লিখিয়া, কাটিয়া, কাগজ ছিঁড়িয়া সে লেখা শেষ করিল। সাজাইয়া, গুছাইয়া, ঘুরাইয়া লিখিল:—তাহার ভাবার্থ,—শৈলই তাহার কবিতার উৎস।

লিখিয়া সে পত্রখানা পাঠাইয়া দিল।

রাত্রি পোহাইতে না পোহাইতে তাহার দৃষ্টি শৈলবালাদের গৃহের সেই ছাতের দিকে আকৃষ্ট হইল। সে ছাতে শৈল প্রায়ই সকালটা কাটাইত। অন্য সহস্র কায থাকিলেও যে ছাতে তাহাকে

বিশবার দেখা যাইত, সেদিন সকালে প্রমথনাথ তাহাকে সে ছাতে আর দেখিতে পাইল না।

মধ্যাহ্নে শৈলবালার মধ্যম অগ্রজ আসিয়া প্রমথনাথকে তাহার কবিতার খাতাখানা ফিরাইয়া দিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, শৈল মাসখানেকের জন্য দমদমার মাসীর কাছে যাইতেছে।

প্রমথনাথ বুঝিল, সে তাসের ঘর গড়িতে গড়িতে অসাবধান হইয়া বেগে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল,—ঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে। একদিনের অনবধানতায় জীবনের সুখস্বপ্ন নষ্ট করিয়াছে বলিয়া সে আপনার উপর আপনি অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইল। তখন হৃদয়ে বেদনাটা এমনই তীব্র বোধ হইল যে, সে কিছুতেই বুঝিল না যে, সে অনিশ্চিতের উদ্বেগের পরিবর্ত্তে নিশ্চিতের যে স্বস্তি পাইয়াছে তাহার মূল্য অনেক অধিক; বাস্তবের ছুরিকায় তাহার কল্পনাদুষ্ট হৃদয়ের চিকিৎসা হইয়াছে, এইবার সে নিবৃত্তি লাভ করিতে পারিবে।

সংবাদপত্রে।

কলিকাতা হাইকোর্টের পূর্ব্বপার্শে রাস্তার পরপারে একটা বৃহৎ অট্টালিকা। পারাবতাশ্রয়ে যেমন বহু পারাবতের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট কক্ষ থাকে, এই অট্টালিকায় তেমনই গোটা পনের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এটর্ণীর আফিস ও ব্যারিষ্টারের 'চেম্বার্' আছে। এই অট্টালিকার দ্বিতলস্থ একটা কক্ষে একখানা রক্তভোজী জীববিশেষে পূর্ণ চেয়ারে বসিয়া নলিনীনাথ ভাবিতেছে। ঘরের মেজে নারিকেলের ছোবড়ায় বোনা 'ম্যাটিং'মোড়া। সেই ম্যাটিংএর উপর একখানা মাদুরে বসিয়া একটা উড়িয়া বালক পাখা টানিতেছে, কাশিতেছে, আর আবশ্যক মত ম্যাটিংএর উপরেই নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেছে। তাহার পার্শ্বেই আফিসের চাপকানপরা মুসলমান দপ্তরী ঘুমাইতেছে। ঘরের চারি দিকে প্রাচীরের কোণে কোণে লম্বা লম্বা 'বুকশেল্‌ফ'গুলা লালফিতা বাঁধা মোকর্দ্দমার কাগজপত্রে পূর্ণ। চাপকান-পরা নলিনীনাথের সম্মুখে একখানা টেব্‌ল ; সেখানার বনাত নানা স্থানে ছিন্ন ; তাহার উপর একখানা 'ব্লটিং-প্যাড্' আছে—সেখানার অবস্থা শোচনীয়। নলিনীনাথের বামে মুক্ত দ্বারপথে দালানের অপর পার্শ্বে এক জন ব্যারিষ্টারের বসিবার ঘরে মক্কেলের গতায়াত লক্ষিত হইতেছে। নলিনীনাথ যে ঘরে বসিয়া আছে, সেই ঘরে তাহার দক্ষিণে একটা লম্বা টেব্‌লে ছয় সাত জন কেরাণী বসিয়া

আছে; কেহ নিবিষ্টচিত্তে দলিল লিখিতেছে, কেহ কি লিখিতে লিখিতে কথা কহিতেছে, কেহ লিখিতেছে, আর লেখা তুলিতেছে, কেহ টেব্‌লে পা তুলিয়া ঘুমাইতেছে, কেহ বা উপস্থিত মক্কেলের নিকট গঙ্গার ইলিশ হইতে কাশ্মীরের শাল পর্য্যন্ত নানা দ্রব্য সম্বন্ধে মুরুব্বীর মন্তব্য প্রচার করিতেছে। নলিনীনাথের সম্মুখে ঘরের দুইটা দ্বারের মধ্যে সংযোজিত কাচের পর্দ্দা দুইটার নিম্ন দিয়া অপর কক্ষে এটর্ণী দুই জনের বসিবার টেব্‌ল ও চেয়ার দেখা যাইতেছে। চেয়ার দুইখানাই শূন্য;—দুই জন এটর্ণীই কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছেন। একটা কাচের পর্দ্দার উপর দিয়া হাইকোর্ট গৃহের গাত্রপ্রাচীরের কয় ফুট স্থান দেখা যাইতেছে; তাহারই মধ্যে একটা স্থানে পাকাগাঁথনির মধ্যে আপনার দৃঢ় মূল বিস্তার করিয়া একটা অশ্বত্থ-শিশু বায়ুহিল্লোলে নাচিতে নাচিতে বুঝি একদিন সমগ্র গৃহটাকে আত্মসাৎ করিবার আশা করিতেছে। ঘরে ক্রমাগত লোক আসিতেছে, যাইতেছে; কেহ কোনও এটর্ণীর খোঁজ লইতেছে, কেহ কোনও কেরাণীর সহিত কথা কহিতেছে, কেহ বা, কি কাযে জানি না, কেবল উঁকি দিয়া যাইতেছে।

নলিনীনাথ সদ্য বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই এটর্ণীর আফিসে কায শিখিতে আসিয়াছে। আজ একখানা দলীল নকল শেষ করিয়া বসিয়া সে পাঁচ বৎসর শিক্ষানবিশীর অবসানে স্বীয় সৌভাগ্যসম্পদের সুখস্বপ্ন রচনা করিতেছে। সে আপনার সৌভাগ্য-কল্পনায় আপনি প্রফুল্ল হইতেছে—দুর্ভাগ্যসম্ভাবনাকে হৃদয়ে স্থানও

দিতেছে না। সে বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় সহসা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে অতি স্পষ্ট ও মধুর স্বরে ডাকিলেন,—"বাবু!"

নলিনীনাথ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—এক অনিন্দ্যসুন্দরী ইংরাজরমণী ; তাঁহার ওষ্ঠাধরে রক্তাভা যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে, তাঁহার গাঢ়নীল নয়নে নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি।

আফিসে সচরাচর যে সকল মক্কেল আসে, তাহাদের মধ্যে ধুতিচাদর-পরা বাঙ্গালী ও মলিন-রঙ্গিন-পাগড়ী-ধারী মাড়োয়ারীই অধিক ; কচিৎ কখন দুই এক জন তাম্রবর্ণ, মোটা সোটা, বলিষ্ঠগঠন ইংরাজ বা ফিরিঙ্গীও আসে ; কিন্তু নলিনীনাথ আসিয়া অবধি এক দিনও আফিসে এরূপ মক্কেল আসিতে দেখে নাই। কেরাণীদিগের বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনের কৌতূহলপূর্ণদৃষ্টি দেখিয়া সে বুঝিল, আফিসে এরূপ মক্কেলের আগমন সুলভ নহে। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া রমণীকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। তিনি ধন্যবাদ দিয়া আসন গ্রহণ করিলেন ; তখন সে বসিল।

রমণী নলিনীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এটর্ণী ?"

নলিনীনাথ বলিল, "না। আমি শিক্ষানবীশ। আপনার কি আবশ্যক ?"

"আপনাকে বলিলেই হইবে কি ?"

"কায যদি সহজ হয়, তবে আমিই তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারি। নহিলে এটর্ণীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। এটর্ণী দুই জনেই কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছেন ;

কখন ফিরিবেন, স্থির নাই। যদি অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা আপনার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়, তবে আমাকে সব বলিয়া গেলেই হইবে; আমি তাঁহাদিগকে সকল কথা বলিব।"

"আমার কায বুঝিতে হইলে আমার জীবনের একাংশের একটু নাতিবিস্তৃত বিবরণ শুনিতে হইবে; নহিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন না। আশা করি, বিরক্ত হইবেন না।"

"বিরক্ত কি? আপনি বলুন।"

নলিনীনাথ একখানা ফুলস্কেপ কাগজ সম্মুখে টানিয়া লইল; দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলে সূক্ষ্মাগ্র পেন্‌সিলটা ধরিল, এবং টেব্‌লের উপর উন্নতভাবে স্থাপিত বামহস্তের করতলে মস্তকের ভারটা আংশিক-রূপে স্থাপিত করিয়া মক্কেলের দিকে চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইল—তিনি যাহা বলিবেন তাহার সারাংশ লিখিয়া লইবে। নলিনীনাথ নূতন ব্যবসায়ের ভড়ংগুলার অভ্যাস করিতেছিল।

রমণী সুস্পষ্ট সুমিষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন;—

"আমি যখন ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসি, সে আজ দশ বৎসরের কথা। আমার স্বামী গভমের্ণ্টের চাকরী লইয়া আমাকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে আইসেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহাকে অত অল্প বয়সে বিবাহবন্ধনবদ্ধ হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাই বাধাপ্রাপ্ত প্রবল প্রবাহের মত তিনি সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিয়াছিলেন,—কাহারও কথা শুনেন নাই। তাঁহার প্রকৃতিতে যথেষ্ট সদ্‌গুণ ছিল; কিন্তু

দোষ বা গুণ তাঁহার প্রকৃতিতে যাহা ছিল, সবই আতিশয্যদোষ-দুষ্ট। তাঁহার হৃদয়ে দয়া, উদারতা, ভালবাসা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে একগুঁয়েমীরও আতিশয্য ছিল। কেহ কোন কায করিতে নিষেধ করিলে তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই কাযটাই করিতেন।

"ভারতবর্ষে আসিয়া আলফ্রেড প্রথমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে একটি মহকুমার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ভারতবর্ষ আমার নিকট অভিনব স্থান—বিস্ময়ের দেশ। এখানে অম্লানোজ্জ্বল রবিকর হইতে পথে ঘাটে পথিকের বেশের বর্ণবৈচিত্র্য পর্য্যন্ত সবই নূতন,—সবই সুন্দর। মেঘকুহেলিকাশূন্য নীল আকাশ, রৌদ্রতপ্ত রাজপথ, পথে বৃহৎকায় হস্তী ও দ্বিচক্র গোযান,—এ যেন আরব্য উপন্যাসের দেশে বিচরণ করিতেছি! তদ্ভিন্ন স্বামীর প্রেম—সেও আমার নিকট যেমন নূতন, তেমনই মধুর। সেও আলফ্রেডের স্বাভাবিক-আতিশয্য-বর্জ্জিত নহে। শত শোভার আগার নূতন দেশে—স্বামীর প্রেম-রাজ্যে আমার দিনগুলা আনন্দে কাটিতে লাগিল। নূতন কার্য্যে, নূতন জীবনে, নূতন সংসারে, আলফ্রেডের ও আমার সময় জল-স্রোতের মত বহিয়া যাইতে লাগিল।

"এখানে আসিয়া একটা ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলাম,—সেটা মানুষে মানুষে প্রভেদ; শ্বেতকায়ে ও কৃষ্ণকায়ে প্রভেদ। শ্বেত-কায়ের প্রতি ভারতবাসীর সভয় সম্মান, আর তাহার প্রতি শ্বেতকায়ের দারুণ ঘৃণা, দুইই বিস্ময়কর। আর এক বিস্ময়ের বিষয়, এ দেশের বহু ভৃত্যের অত্যাচার। দেশে আমাদের ভৃত্যসংখ্যা নিতান্তই অল্প;

এখানে বহু ভৃত্য আমাদের হইয়া সকল কার্য্য করিতে গিয়া আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলে।

"আলফ্রেড বড় সামাজিক লোক ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে সকলেই পরম প্রীত হইতেন। সেই মফঃস্বল সহরের প্রায় সকল ইংরাজ কর্ম্মচারীই সর্ব্বদা আমাদের গৃহে আসিতেন। মফঃস্বলে এক এক স্থানে যে কয় জন ইংরাজ থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে মেশামিশি খুবই অধিক হয়। প্রবাস বন্ধুত্বের বন্ধন বড় দৃঢ় করে; বিদেশ পরকে আপন করে। আমরা যে স্থানে ছিলাম, সে স্থানে একটা সেনানিবাস ছিল। তথা হইতে সৈনিক কর্ম্মচারীরা প্রায়ই আমাদের গৃহে সমাগত হইতেন। সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে এক জন নিত্যই আমাদের গৃহে আসিত। তাহাকে যুবক না বলিয়া, বাল্য ও যৌবন এতদুভয়ের মধ্যসীমায় অবস্থিত বলিলেই অধিক সঙ্গত হয়। তাহার মুখে কেবল গোঁফের রেখা দিয়াছে; নবোদ্গত গুম্ফরাজি তাহার আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও কিছুতেই রাতারাতি 'কর্ণেলে'র গোঁফের মত হইয়া উঠিতেছে না। আমরা সবাই হ্যারীকে 'ছেলেমানুষ' বলিতাম। তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণ তাহাকে নিতান্তই বালক ভাবিতেন। অল্পবয়স্ক বলিয়া সে বেচারী আমাদের হাস্য-পরিহাসে তেমন যোগ দিতে পারিত না, এক পার্শ্বে বসিয়া থাকিত। তবু সে নিত্য সন্ধ্যাকালে আমাদের বাড়ী আসিত। আমরা সকলেই হ্যারীকে ভাল বাসিতাম।

'নিতান্ত প্রবল বিঘ্ন ব্যতীত সন্ধ্যায় হ্যারীর আমাদের গৃহে

আসার কামাই হইত না। সামান্য বাধাবিঘ্ন,—এমন কি, সামান্য ঝড়বৃষ্টিতেও তাহার আসা বন্ধ হইত না। এক এক দিন বিদ্যুচ্চকিত ঘনান্ধকার রজনীতে বৃষ্টি মাথায় আসিয়া সে আলফ্রেডের কাছে কত স্নেহতিরস্কার ভোগ করিত! ক্রমে এমনই হইয়া উঠিয়াছিল যে, যখন পুষ্পসৌরভসমাকুল মন্দানিলবীজিত নিশামুখে মেঘকুজ্‌ঝটিকাহীন স্বচ্ছান্ধকারব্যাপ্ত আকাশে একে একে নক্ষত্রফুল ফুটিয়া উঠিত, মাথায় পাগড়ীপরা ভৃত্য কক্ষে কক্ষে আলোক জ্বালিয়া দিত, এবং দূরে সহরের হিন্দু অধিবাসিগণের অধ্যুষিত অংশ হইতে আরতির নহবৎধ্বনি কোমল হইয়া আসিয়া যেন শান্তসন্ধ্যায় এক স্নিগ্ধ মাধুরীভরা করুণতার সঞ্চার করিয়া দিত,—তখন হ্যারী না আসিলেই মনে হইত,—কেন সে আসিল না? আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিবার পরও অনেকদিন অবধি সন্ধ্যাসমাগমে আমার হ্যারীকে মনে পড়িত। সেটা বোধ করি ভাবসাহচর্য্যমাত্র। আলফ্রেড বিদ্রূপ করিয়া হ্যারীকে বলিতেন, 'হ্যারী, তুমি আমাদের ঘড়ী! তুমি আসিলেই বুঝি, রাত্রি আসিতেছে।'

"কতকগুলা জিনিস আছে, যেগুলা পুরুষ সহসা বুঝিতে পারে না, রমণী সহজেই পারে। প্রেম সেইগুলার মধ্যে একটা। কাহারও কাতর নয়নের সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে প্রেমের প্রকাশ লক্ষ্য করা, কাহারও মুখের ভাবে প্রেমের প্রভাব অনুভব করা, কাহারও কথাবার্ত্তা, গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তাহাতে প্রেমের ছায়াপাত অনুমান করা—পুরুষের কার্য্য নহে। প্রেমিক যে দিন সসঙ্কোচে

বাধ-বাধ কথায়, লজ্জাকম্পিত স্বরে প্রেমিকার নিকট আপনার হৃদয়ের প্রেমের কথা ব্যক্ত করে, প্রেমিকা তাহার বহুদিন পূর্ব্বেই তাহার হৃদয়ে প্রেমের প্রথম কোকিলকূজন শুনিতে পাইয়াছে, এবং প্রেমিকের হৃদয়ে লজ্জায় ও আবেগে অহরহঃ দ্বন্দ্ব দেখিয়া মনে মনে অনেকবার হাসিয়াছে। রমণী যে পুরুষকে আত্মসমর্পণ করে, সে কেবল একটা উৎকট আবেগে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া মুহূর্ত্তের অন্ধতায় নহে; তাহার কার্য্য চিন্তিতপূর্ব্ব—বহুদিন পূর্ব্বে স্থিরীকৃত। পুরুষ প্রবল ঝঞ্ঝা, সে আপনার বেগে এক দিকে যায়, কোন্ গাছ ভাঙ্গিবে, কোন্ গৃহ ভূমিসাৎ হইবে, কোন্ নদী কূল ছাপাইবে, সে সব কথা সে ভাবে না। রমণী মৃদু মন্দানিল, সে যে পাতাটি দুলায়, যে ফুলটি ফুটায়—সবই ভাবিয়া। তাই যে প্রেম—যে সম্বন্ধ সমাজে নিন্দনীয়, সে প্রেমে, সে সম্বন্ধে পুরুষের তত দোষ নাই; রমণীর দোষের সন্দেহমাত্র নাই।

"আমি বুঝিলাম, হ্বারী আমাকে ভালবাসে। সাধারণতঃ ভালবাসা বলিলে আমরা যাহা বুঝি, এ সে ভালবাসা নহে; ইহাতে দারুণ লালসা নাই, প্রগাঢ় ভক্তি আছে;—উচ্ছৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষা নাই, শুদ্ধ শ্রদ্ধা আছে। আমি বুঝিলাম, হ্বারী কখনও আমার কাছে তাহার ভালবাসার কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবে না, সে দূরে থাকিয়াই আমার উপাসনা করিবে। আপনি দেবদেবী-পূজক—মূর্ত্তিপূজক হিন্দু, আপনি সে ভালবাসার কথা বুঝিতে পারিবেন। আপনি দেবীর উপাসনা করেন, তাঁহার কৃপাকটাক্ষ

পাইলে আর সব ত্যাগ করিতে পারেন, অথচ কবিকল্পনার সৌন্দর্য্য-সার সে মূর্ত্তির দিকে লালসা-কলুষিত দৃষ্টিতে চাহিতে পারেন না—দূরে থাকিয়া ভক্তিভরা নয়নে সেই দিকে চাহিয়া থাকেন ; আপনি সে ভালবাসা বুঝিতে পারিবেন।

"হ্যারী যতক্ষণ আমাদের কাছে থাকিত, তাহার তৃষিত নয়নের সাগ্রহ দৃষ্টি আমার প্রত্যেক গতিবিধির অনুসরণ করিত। কোনও দিন আমাদের গৃহে আসিয়া বসিবার ঘরে আমাকে দেখিতে না পাইলে, তাহার দৃষ্টি চারি দিকে কাহার অন্বেষণ করিত, তাহা আমি জানিতাম। আমার রুমাল বা পাখা পড়িয়া গেলে তাহা কুড়াইতে, আমার কোনও জিনিসের আবশ্যক হইলে তাহা আনিতে হ্যারীর ব্যাকুল ইচ্ছার সীমা থাকিত না ; কিন্তু লজ্জায় সে কোনও কাযই করিতে পারিত না ; কেবল তাহার মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিত। আমি সে সবই লক্ষ্য করিতাম।

"আমরা যে স্থানে থাকিতাম, সে স্থান হইতে অনতিদূরে একটা ছোট পাহাড়ের উপর একটা প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছিল। আলফ্রেড একদিন সেথায় যাইবার জন্য একটা দল স্থির করিলেন। স্থির হইল,আমরা প্রত্যূষে অশ্বে যাইয়া ভগ্নাবশেষ দেখিয়া প্রভাতেই ফিরিয়া আসিব। গমনকালে গমনপথে যে স্থানে আমাদের সকলের মিলিত হইবার কথা ছিল, হ্যারী সে স্থানে ছিল না। সেনানিবাস হইতে আর যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, সে প্রত্যূষে তাঁহাদের পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে, কোথায় গিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না।

"আমরা অল্প দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম, ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণ আলির উপর দিয়া যাইতে হইবে, সে পথে অশ্ব চলে না। অগত্যা আমাদিগকে অশ্ব ছাড়িয়া সাবধানে হাঁটিয়া যাইতে হইল। পূর্ব্ব গগনে মেঘের উপর যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; লোহিত আভায় সমগ্র পূর্ব্বগগনপ্রান্ত রঞ্জিত হইয়া গেল। চারি দিকে বিনিদ্র বিহঙ্গকুল মধুর বিরাবে প্রভাতের আবাহন করিল। সূর্য্যোদয় হইল। ক্রমে সূর্য্যকর প্রখর হইয়া উঠিল। আমরা যখন গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলাম, তখন মাথার উপর দীপ্ত রবিকর; আমরা সকলেই শ্রান্ত। সে স্থানে উপনীত হইয়া দেখি, হ্যারী একটা বড় গাছতলায় একখানা গালিচা বিছাইয়া আমাদের বিশ্রামের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে, এবং সেই শ্রান্তির পর আমাদের শ্রমাবসানের জন্য খাদ্য ও পানীয় রাখিয়াছে। দেখিয়া সবাই অবাক! কর্ণেল হ্যারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কখন আসিলে?' হ্যারী বলিল, 'আমি জানিতাম, আপনারা আসিতে শ্রান্ত হইবেন, তাই আপনাদের শ্রমবিনোদনের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি। আপনাদের বিস্ময়োৎপাদনের জন্য আগে এ কথা বলি নাই।' আমি বুঝিলাম—এ অনুষ্ঠান কাহার জন্য।

"আমি নিশ্চয় জানিতাম, হ্যারী কখনও আমাকে বা আর কাহাকেও তাহার ভালবাসার কথা জানাইবে না; সে কেবল দূরে থাকিয়া আমার উপাসনা করিবে। যদি এক জন দূরে থাকিয়া নিত্য তোমার উপাসনা করে, তাহার জীবনপ্রবাহ তোমার দিকে

প্রবাহিত হয়, অথচ তোমাকে স্পর্শ করিতে সাহস না করে,—সে কেবল তোমার উপাসনা করিয়াই তৃপ্তিলাভ করে, তবে কে স্বেচ্ছায় সেই উপাসনার প্রত্যাখ্যান করে? কে সেই ভক্তিভরা ভালবাসার অর্চ্চনায় হৃদয়ে তৃপ্তির অনুভব না করে? আমার দুর্ব্বলতা বলিতে হয় বলুন, আমি সেই উপাসনার প্রত্যাখ্যান করিবার কোনও কারণ দেখিলাম না। আমি তাহাতে তৃপ্তি অনুভব করিতাম। আমি তাহার শ্রদ্ধার বেদীর উপর দেবীপ্রতিমার মত তাহার ভালবাসার অর্চ্চনা লইতে কোনও দোষ নাই, মনকে এমনই বুঝাইতাম।

"এই সময় একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমি চারি দিক অন্ধকার দেখিলাম। মফঃস্বলপরিদর্শনে যাইয়া দুরন্ত বিসূচিকায় আলফ্রেডের মৃত্যু হইল। আমার সকল সুখস্বপ্ন টুটিল, আমি অসহায়া, সংসারে অনভিজ্ঞা,—অথচ আমার নিজের সব আমাকেই করিতে হইবে! আশ্রয়তরুচ্যুতা ব্রততীর মত আমি নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। আমি অকূল পাথারে ভাসিলাম। সেই আমার প্রথম শোক,সেই আমার প্রথম দারুণ দুশ্চিন্তা ও যাতনা। এত দিন প্রেমের স্বপ্নে,প্রাচুর্য্যে,চিন্তাহীন—সুখময় জীবন কাটাইয়াছি; এখন কি করি?

"আলফ্রেডের জীবন বীমা করা ছিল। দ্রব্যাদি সব বিক্রয় করিয়া আমি সেই টাকাটা বাহির করিতে কলিকাতায় আসিলাম। টাকা পাইলাম। কিন্তু সে কয় সহস্র টাকায় কয় দিন চলিবে? দেশে ফিরিয়া আত্মীয়স্বজনগণের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। আমি কি কার্য্য করিব?

সংবাদপত্রে।

"পূর্ব্বে আমি সখ করিয়া মধ্যে মধ্যে কোনও কোনও সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতাম। ভাবিলাম, যদি সম্ভব হয়, সংবাদপত্রে লিখিয়াই জীবিকার অর্জ্জন করিব। স্বাধীন ব্যবসায়; যেমন শ্রম করিতে পারিব, তেমনই পারিশ্রমিক পাইব। পূর্ব্বে সংবাদপত্রে যে সব প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলাম, সেইগুলা লইয়া একদিন উদ্বেগাকুলহৃদয়ে একখানা সংবাদপত্রের সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সম্পাদক আমার অবস্থা শুনিলেন, আমার লিখিত প্রবন্ধগুলায় চক্ষু বুলাইলেন; শেষে বলিলেন, 'আপনি লিখিতে পারেন। আপনি যদি স্বীকৃত হয়েন, তবে আমি যেরূপ বলিব, কাগজে সেইরূপ লিখিতে পারেন।' আমি স্বীকার করিলাম। পারিশ্রমিকের বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল। আমি সেই সংবাদপত্রে নিয়মমত লিখিতে লাগিলাম। সে আজ প্রায় আট বৎসরের কথা।

"এ কয় বৎসর আমি সংবাদপত্রে নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিতাম। ক্রমে ক্রমে কাগজখানার সহিত আমার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছিল। গত ক্রীষ্টমাসের সময় আমাদের প্রচলিত প্রথামত সংবাদপত্রে গোটাকয়েক গল্প দিবার কথা। কিন্তু গল্পের বড় অভাব। সম্পাদক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নিত্য নানারূপ প্রবন্ধ লিখিয়া আমার আত্মশক্তিতে কিছু অতিরিক্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, আমি আজ বাড়ী যাইয়া একটা ছোট গল্প লিখিব। কাল পাইবেন।' সম্পাদক নিশ্চিন্ত হইলেন।

"প্রথম যখন এ দেশে আসি, তখন রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ মধ্যাহ্নে বাঙ্গলোয় একাকিনী আরাম-কেদারায় শুইয়া নূতন দেশের নানা বিষয় ঘটিত গল্পের আখ্যানবস্তু মাথায় আসিত। আমি কখনও গল্প লিখিবার চেষ্টা করি নাই; করিলেই বুঝিতাম যে, গল্প লেখাটা যত সহজ ভাবিতাম, বাস্তবিক ব্যাপারটা তত সহজ নহে। চেষ্টা করি নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস ছিল,—চেষ্টা করিলেই ভাল গল্প লিখিতে পারিব। এখন দেখিলাম, সম্পাদকের আবশ্যকমত 'প্যারা' ও প্রবন্ধ লিখিয়া কল্পনা-সিন্ধু বিশুষ্ক—তাহা মন্থন করিয়া সুধা বা গরল কিছুই উঠে না। আমি মহা বিপদে পড়িলাম। কাল আমি গল্প দিব, এই ভরসায় সম্পাদক সব বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এখন কি করি?

"রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত কলম হাতে করিয়া বসিয়া ভাবিলাম। সবই বিফল। শেষে সহসা মনে হইল, হ্যারীকে নায়ক করিয়া তাহার প্রেমকাহিনীর ভিত্তির উপর একটা গল্প রচনা করি না কেন? শেষে তাহাই করিলাম। আলফ্রেডের ও আমার সেই মফঃস্বল সহরে গমন হইতে আলফ্রেডের মৃত্যু ও আমার সেই সহরত্যাগ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার প্রায় যথাযথ বর্ণনা করিলাম; কেবল মধ্যে মধ্যে কোথাও বা একটু রং বদলাইতে হইল, কোথাও বা একটু রং চড়াইতে হইল। তাহার পর কল্পনার আশ্রয় লইতে হইল; দেখিলাম, কল্পনা সদয়। আমি গল্পের শেষাংশে লিখিলাম, উপাসিতার গমনের সঙ্গে সঙ্গে হ্যারীর অধঃপতনের সূত্রপাত হইল, উপাসিতার বিরক্তির ভয় এতদিন তাহাকে যে পথে গমন হইতে বিরত রাখিয়াছিল, এখন সে সেই

পথে গমন করিল। সে ভাবিল, কাহারও প্রতি তাহার কোন কর্ত্তব্য নাই, সে সাধারণ সৈনিকদিগের পৈশাচিক উত্তেজনায়, আমোদ প্রমোদে যোগ দিতে আরম্ভ করিল;—ক্রমে একেবারে উৎসন্ন গেল।

"যখন গল্প শেষ করিয়া শয়ন করিলাম, তখন প্রায় প্রভাত। ঘুম ভাঙ্গিতে বেলা হইল। আফিসে যাইয়া সম্পাদককে গল্পটা দিলাম; তিনি সেটা পড়িয়া ছাপিতে দিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে সুদূর মফঃস্বল সহরে যে নাটকের অভিনয় হইয়াছিল—সে অভিনয়ের কথা আমি ছাড়া কেবল প্রধান অভিনেতা ব্যতীত আর কেহ জানিতও না; সে অভিনয়ের ভিত্তির উপর স্থাপিত গল্পটা পড়িয়া কেহ যে কিছু বুঝিতে পারিবে, আমি তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। হ্যারী যে এই পত্র পড়িতে পারে, এ সম্ভাবনা আমার কল্পনারও অতীত ছিল। কাজেই রমণীসুলভ দূরদর্শিতার অভাবে আমি গল্পে সব নামগুলিরও পরিবর্ত্তন করি নাই।

"গল্পটা ছাপা হইবার পর যখন সেটা পড়িলাম, তখন একবার মনে হইল,—কাযটা কি ভাল হইয়াছে? যদি কেহ বুঝিতে পারে? কিন্তু যখন সম্পাদক হইতে কার্য্যাধ্যক্ষ পর্য্যন্ত আফিসের সকলেই গল্পটার প্রশংসা করিতে লাগিলেন; যখন সম্পাদক আমাকে বলিলেন, 'আপনার গল্প লিখিবার ক্ষমতা আছে, অবহেলায় নষ্ট করিবেন না। লিখুন। আপনি নিশ্চয়ই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান লেখকদিগের মধ্যে স্থায়ী আসন পাইবেন।'—তখন আমার আশঙ্কা

গর্ব্বে নিমগ্ন হইয়া গেল। রাতারাতি একটা বড় গল্প-লেখক হইবার আশায় আমি নানা ধরণের নানা গল্প-রচনায় চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

"গল্পটা প্রকাশিত হইবার পঁচিশ দিন পরে সে দিনের প্রবন্ধ ও 'প্যারা' লইয়া আফিসে প্রবেশ করিলাম। তখন অদূরে গির্জ্জার ঘড়ীতে এগারটা বাজিল। সম্পাদকের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিব, এমন সময় কক্ষমধ্যে দুই জনের কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। সম্পাদকের কণ্ঠ পরিচিত; অপরের কণ্ঠ অপরিচিত।

"অপরিচিতকণ্ঠ একটু উত্তেজিতভাবে বলিলেন, 'এ গল্প কাহার লেখা?'

"সম্পাদক স্থিরস্বরে বলিলেন, 'তাহাতে আপনার কায কি? তিনি যিনিই হউন, আমি আপনাকে তাঁহার নাম দিতে বাধ্য নহি; দিবও না।'

"'এক জনের জীবনকাহিনী বিবৃত করিবার আপনি কে? এক জন অতি গোপনে যে কথা দীর্ঘকাল ধরিয়া অন্যের অজ্ঞাতে মর্ম্মতলে লুকায়িত রাখিয়াছে, কোন্ অধিকারে আপনি সে কথা সাধারণের উদ্রিক্তকুতূহলদৃষ্টির সমক্ষে আনিতে পারেন?'

"'সে অধিকার-বিচারের স্থান এ নহে। আপনি কি উন্মাদ? যদি ভদ্রলোক হয়েন, বিনা বাক্যব্যয়ে এ কক্ষ ত্যাগ করুন।'

"'আমিই ভ্রান্ত। আমি অন্ধ উত্তেজনায় আপনাকে চাবকাইতে আসিয়াছিলাম। এখন নিজের ভ্রম বুঝিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।'

"আগন্তুকের কণ্ঠস্বর যেন আবেগে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, 'যাহাই হউক, অনুগ্রহ করিয়া গল্প-লেখককে বলিবেন, তিনি মানব-চরিত্র বুঝেন না। সকল মানব পশু নহে; সকল প্রেম অধঃপতনের পথ নহে। তিনি যে প্রেমের বর্ণনা করিয়াছেন, সেই প্রেমই প্রেমিককে সকল অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করে।'

"আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। আগন্তুক বাহিরে আসিয়াই আমার সম্মুখে পড়িলেন। আমি চিনিলাম—হ্যারী! আট বৎসরে তাহার চেহারায় অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু আমার চিনিতে কষ্ট হইল না। সম্মুখে আমাকে দেখিয়া প্রথমে হ্যারীর গণ্ডদ্বয় আকর্ণ রক্তিমাভ হইয়া উঠিল; তাহার পর মুহূর্ত্তমধ্যে সে বর্ণ কপোতকর্ব্বুরে পরিণত হইল।

"আমি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কৃত্রিম প্রফুল্লতাসহকারে বলিলাম, 'হ্যারী, কেমন আছ?' আমি করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইলাম, হ্যারী আমার প্রসারিত কর গ্রহণ করিল না। সে মাতালের মত অস্থির ভাবে এক পদ পিছাইয়া গেল, তাহার পর বলিল, 'তবে আপনিই গল্প লিখিয়াছেন?'

"আমি আবার বলিলাম, 'হ্যারী, কবে আসিয়াছ?'

"হ্যারী সে কথার উত্তর দিল না; বলিল, 'আপনি কাযে যাইতেছেন, আমি বিলম্ব করাইব না।' তাহার পর একবার আমার দিকে চাহিয়া মস্তক অবনত করিয়া সে দ্রুতপদে সে স্থান হইতে

নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহার সে দৃষ্টিতে কি যাতনা, কি তিরস্কার! সেই দৃষ্টির স্মৃতি এখনও যেন শাণিত ছুরিকার মত আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে।

"আমি তাহার সহিত দেখা করিতে চাহি। তাহার নিকট ক্ষমা না চাহিয়া আমি স্থির হইতে পারিব না।

"এখন কি করা কর্ত্তব্য?"

রমণীর শেষ প্রশ্ন শুনিয়া নলিনীনাথ যেন চমকিয়া উঠিল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া এতক্ষণ সে তদ্গতচিত্তে তাঁহার কথা শুনিতেছিল। কাগজে পেন্সিলের একটা আঁচড়ও কাটা হয় নাই!

রমণী আবার বলিলেন, "হ্যারী এখন কোথায় আছে, আমি জানিতে চাহি। আমি বরাবরই তাহাকে কেবল 'হ্যারী' বলিতাম, তাহার বংশগত নাম ভুলিয়া গিয়াছি। সেদিন তাহার বেশ দেখিয়া বুঝিয়াছি, সে এখন সেনাবিভাগে উচ্চপদস্থ। আপনারা আমাকে তাহার সন্ধান জানিয়া দিন। তাহার জন্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া বা আর যাহা করা আবশুক বিবেচনা করেন, করুন। খরচ যাহা হয়, আমি দিব। এখন এই টাকা লউন, আর যাহা খরচ হয়, লিখিলেই দিব।"

রমণী ব্যাগ হইতে একখানা এক শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। নলিনীনাথ বলিল, "এখন টাকা দিবার প্রয়োজন নাই। আমি এটর্ণীদিগকে সব কথা বলিয়া আপনাকে

তাঁহাদের অভিমত জানাইব। অনুগ্রহ করিয়া আপনার ঠিকানা দিবেন কি ?"

রমণী আপনার কার্ড দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নলিনীনাথকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া রমণী বলিলেন,—"আমি আগামী কল্য এই সময়ে আসিব। আপনি এটর্ণীদিগকে সব বলিয়া, তাঁহাদের মত লইতে ভুলিবেন না।" তাহার পর তিনি কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

রমণী চলিয়া যাইতে না যাইতেই দুই তিন জন কেরাণী তাড়াতাড়ি আসিয়া নলিনীনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, ব্যাপারটা কি ? মেম কি বলিল ?" নলিনীনাথ যেন একটু বিরক্তিসহকারে উত্তর দিল, "সে কথায় তোমাদের কায কি ?" কেরাণী কয় জন আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিল। তাহারা যে যাহার চেয়ারে বসিল।

নলিনীনাথ বসিয়া ভাবিতে লাগিল ; আর অপমানিত কেরাণীরা মধ্যে মধ্যে তাহার প্রতি বিরক্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে এটর্ণী দুই জনের মধ্যে এক জন ফিরিলেন। তিনি আফিস হইতে যাইবার সময় বা আফিসে আসিবার সময় কখনও ধীরপদে চলিতেন না। তিনি নলিনীনাথের বসিবার ঘরের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে আপনার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি চোগাটা খুলিয়া চেয়ারে বসিতে না বসিতে নলিনীনাথ তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল। টেব্‌লের কাছে একখানা চেয়ার টানিয়া

বসিয়া নলিনীনাথ এটর্ণীকে সব কথা বলিল। সব শুনিয়া এটর্ণী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এরূপ মক্কেল এটর্ণীর আফিসে দুর্লভ, এবং আপনার মত যুবকের পক্ষে প্রলোভনের বিষয়। এ ব্যাপারটা প্রেমঘটিত। এটর্ণীর আফিসে নানাপ্রকার দান ও বিনিময়ের কায হয় বটে, কিন্তু চিত্তদান ও প্রেমবিনিময়, এ ব্যাপার, বোধ হয়, কখনও হয় নাই। যাহা হউক—তিনি যাহা করিতে বলেন, আমরা করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি টাকাটা রাখিলেন না কেন? কাল তিনি যখন আসিবেন, তখন আমি যদি আফিসে না থাকি—রসিদ দিয়া টাকাটা লইবেন।"

শুনিয়া নলিনীনাথ আপনার বসিবার ঘরে আসিতেছিল। সে দ্বার অবধি আসিতে এটর্ণী আবার বলিলেন, "কাল যখন মহিলাটি আফিসে আসিবেন, তখন যদি আমি আফিসে না থাকি, তবে রসিদ দিয়া টাকাটা রাখিতে ভুলিবেন না।"

অপেক্ষা।

১

কয় বৎসর পনের টাকা বেতনে নানা স্থানে ব্রাঞ্চ পোষ্ট-আফিসে পোষ্টমাষ্টারী করিয়া আমি উন্নতির প্রথম সোপানে পদার্পণ করিলাম; কুড়ি টাকা বেতনে মধুপুর পোষ্ট-আফিসে ঠিকা পোষ্ট-মাষ্টার নিযুক্ত হইলাম। মধুপুর অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। স্বাস্থ্য ও বেতন উভয়েরই উন্নতির আশায় আমার কল্পনা মধুপুরকে মধুপুরই দেখিতে লাগিল।

রাত্রির গাড়ীতে মধুপুরে উপনীত হইলাম। পরদিন কার্য্যভার লইব। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পোষ্ট-মাষ্টারের সহিত ডাক কাটিলাম, চিঠি বাছিলাম। হরকরারা বিলি করিতে বাহির হইবে, এমন সময় সহসা আফিসঘরের বারান্দায় যেন মৃত্যু ও জীবন একত্র উপনীত দেখিলাম। দুই জন ইংরাজমহিলা আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন; প্রথমা বৃদ্ধা—বিষণ্নাননা; দ্বিতীয়া যুবতী, অনিন্দ্য-সুন্দরী—সর্ব্বাঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবনের নিটোল সৌন্দর্য্য, কিন্তু নয়নে ও আননে চাঞ্চল্যচিহ্নমাত্র নাই—গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান। উভয়েরই বেশ সাদাসিদা।

আমি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বৃদ্ধা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আমার কোনও পত্র আছে?"

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী পোষ্ট-মাষ্টার নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "না।"

বৃদ্ধা ও যুবতী এই সংবাদের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

পূর্ব্ববর্ত্তী পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "আমি এ আফিসে আপনাকে সে সকল জিনিস বুঝাইয়া দিয়া যাইব, তাহার একটি এই।"

আমি তাঁহার কথা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, "চার বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন এই আফিসে আসি, তখন আমার পূর্ব্ববর্ত্তীও আমাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি দুই বৎসর এই আফিসে ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীও তাঁহাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন।"

আমি বলিলাম, "আসল ব্যাপারটা কি ?"

তিনি বলিলেন, "বৃদ্ধা কোনও নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পত্রের আশায় প্রতিদিন পোষ্টআফিসে সন্ধান লইয়া থাকেন। সে পত্র আইসে না। মধ্যে মধ্যে ক্বচিৎ কোনও পত্র আসে, তাহাতে বৃদ্ধার মন উঠে না।"

"যুবতী কি বৃদ্ধার কন্যা ?"

"না—আত্মীয়া। বৃদ্ধার মস্তিষ্ক বোধ হয় বিকৃত।"—এই বলিয়া তিনি হাস্য করিলেন।

নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্য মাতৃহৃদয়ের বেদনাময় ব্যাকুলতায় এ উপহাস আমার ভাল লাগিল না। আমি বাল্যে মাতৃহীন। মৃত্যুশয্যায়

মা, আমার মুখে চাহিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছিলেন—এ অসহায় বালককে কে দেখিবে? তাঁহার মৃত্যুর পর পিতা আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। বিমাতার ব্যবহারে আমি যাতনা পাইয়াছি, আমার জন্য পিতাও কেবল কাঁদিয়াছেন। তখনও বড় যাতনায় কাঁদিয়া ডাকিয়াছি,—"মা আমার, তুমি কোথায়?" আজও সংসারের স্রোতে লঘু তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে যখন দুঃখাবর্ত্তে আর উদ্ধারের উপায় দেখি না, তখন কাঁদিয়া ডাকি,—"মা আমার, তুমি কোথায়?" উদ্ধার পাইলে মনে করি, সেই স্নেহময়ীর পুণ্যবলেই আমি—অধম সন্তান—উদ্ধার পাইলাম। আজ নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্য জননীর ব্যাকুলতায় আমার হৃদয়ে সেই কথা জাগিয়া উঠিল; আমি কথা কহিতে পারিলাম না।

স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, আমার এ ভাব আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাশয়ের ভাল লাগিল না।

২

জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত দুঃখে ও কঠোর কর্ত্তব্যের দারুণ যন্ত্রণায় একটি বৎসর কাটিয়া গেল। বৃদ্ধা প্রতিদিন প্রাতে যুবতীকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন, জিজ্ঞাসা করিতেন, "মহাশয়, আমার কোনও পত্র আছে?" আমি উত্তর করিলে তাঁহারা ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিতেন। এই এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার নামে দুই তিনখানি পত্র আসিয়াছিল। আমি সাগ্রহে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম, তিনি আসিলে সে পত্র দিতাম। কিন্তু পত্র দেখিয়া বৃদ্ধা বিষণ্ণ-

ভাবে মস্তক-সঞ্চালন করিতেন, "এ পত্র নহে।" সে পত্র তিনি স্বয়ং পাঠও করিতেন না, যুবতীকে ডাকিয়া দিতেন, "মড, এই লও।" রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই—বৃদ্ধা যুবতীকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ পুত্রের পত্রের সন্ধানে আসিতেন। হায় মাতৃহৃদয়!

আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম, আমি তাঁহাকে যে শ্রদ্ধার ভাব দেখাইতাম, তাহাতে বৃদ্ধা আমাকে ধন্যবাদ দিতে ব্যগ্র হইতেন। বুঝিতে পারিলাম, এ সামান্য শ্রদ্ধাও তিনি আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের নিকট প্রাপ্ত হয়েন নাই।

ক্রমে এমনই হইল যে, ডাক আসিলে আমি সাগ্রহে তাঁহারই পত্রের সন্ধান করিতাম, সে পত্র না পাইয়া হতাশ হইতাম। যদি এক দিন নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পত্র দিয়া মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা নিবারিত করিতে পারিতাম! কিন্তু আমার দুর্দ্দশা-দাবানল-দগ্ধ জীবনের কোন্ আশা—কোন্ বাসনা পূর্ণ হইয়াছে? দীর্ঘ এক বৎসর বহিয়া গেল—আমার সে আশা পূর্ণ হইল না—সে পত্র আসিল না।

বৃদ্ধা প্রতিদিন আসিয়া পত্রের সন্ধান লইতেন—জিজ্ঞাসাকালে আশায় ও উদ্বেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইত; সে পত্র আসিল না দেখিয়া ফিরিবার সময় তাঁহার বিষণ্ণ মুখে বিষাদের ছায়া যেন গাঢ়তর হইয়া উঠিত।

এই মহিলাদ্বয়ের পরিচয় জানিবার জন্য মনে কৌতূহল জন্মিত; কিন্তু ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম না। হরকরারা স্থানীয় লোক। কিন্তু তাহারা, বা অন্য কেহই

তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় বা অবস্থার বিষয় বিশেষ কিছু বলিতে পারিত না। তাঁহারা যেন চারি দিকের সকল হইতে স্বতন্ত্র; সকলের মধ্যে থাকিয়াও স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত। আর যে কয় ঘর য়ুরোপীয় মধুপুরে ছিলেন, তাঁহাদের গৃহে কোনও কর্ম্মোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইলে ইঁহারা অতি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেন—পারিবারিক কারণে নিমন্ত্রণ-গ্রহণে অক্ষমতা জানাইতেন। ক্রমে তাঁহারা ইঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে বিরত হইয়াছিলেন। সকলেই ইঁহাদিগকে প্রহেলিকার মত মনে করিত।

যাহা হউক, এক বৎসর পরে তাঁহাদিগের পরিচয় জানিবার সুযোগ অপ্রত্যাশিতরূপে উপস্থিত হইল।

৩

শীত কেবল গিয়াছে। বাতাস নাতিশীতোষ্ণ—মধুরস্পর্শ। পিককণ্ঠে বঙ্গের স্বল্পায়ু বসন্তের সাড়া পড়িয়াছে; গলিতপত্র রিক্তশাখ তরুর সর্ব্বাঙ্গে নবীন পল্লব-শ্রী কেবল বিকশিত হইয়া উঠিতেছে—তখনও নবপল্লবে তরুলতার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। মাঠে শিমুলগাছগুলি উজ্জ্বল লোহিত কোমল পুষ্পে পূর্ণ; দূর হইতে এক একটি বৃক্ষ এক একটি লোহিত পুষ্পস্তূপ বলিয়াই অনুমিত হয়। অন্যান্য বৃক্ষেও কেবল দুই চারিটি ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। মধুপুরে উদ্যানে উদ্যানে গোলাপের আর অন্ত নাই। আমি আফিসের প্রাঙ্গনে যে কয়টি গোলাপগাছ লাগাইয়াছিলাম, তাহাদের নবীন শাখাও ফুলভরে নত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রেম-মরীচিকা।

অপরাহ্ণে আর আফিসঘরে বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না, ভ্রমণে বাহির হইলাম।

বেড়াইতে বেড়াইতে গ্রামের যে দিকে উপনীত হইলাম, সে দিক অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। সে দিকে কয় ঘর য়ুরোপীয়ের বাস। রাজপথ পরিচ্ছন্ন—উভয় পার্শ্বে সযত্ন-সংরক্ষিত উদ্যানমধ্যে সুদৃশ্য গৃহ—নয়নারাম। উদ্যানে কুসুম-শোভা। কোথাও বা তাহারই মধ্যে স্বাস্থ্য-লাবণ্য-শ্রী-সম্পন্ন সুন্দর বালকবালিকারা খেলা করিতেছে,—প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে; কোথাও বা শ্যামশষ্পাস্তৃত ভূমিখণ্ডে পুরুষ ও মহিলারা ক্রীড়ারত, অথবা বেঞ্চে বা চেয়ারে বসিয়া হাস্যবহুল আলাপে নিযুক্ত। আমি সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম।

কয়টি গৃহ অতিক্রম করিয়া একটি কোলাহলহীন গৃহের দ্বারে উপনীত হইলাম। বৃদ্ধা সেই গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমাকে অভিবাদন করিলেন, এবং আমি প্রত্যভিবাদন করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই বুঝি আপনার গৃহ?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "এই আমার কুটীর।"

প্রাঙ্গণে উপবনে রাশি রাশি গোলাপ ফুটিয়াছিল। আমি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "কি সুন্দর ফুল!"

বৃদ্ধা বলিলেন, "আপনি ফুল ভালবাসেন? হাঁ, তাই ত। মড

অপেক্ষা।

আমাকে বলিতেছিল, আপনি ডাকঘরের প্রাঙ্গণে উদ্যান রচনা করিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া ভিতরে আসুন। গুটিকতক ফুল লইবেন।"

আমি উদ্যানে প্রবেশ করিলাম।

এক জন মালী উদ্যানে গোলাপফুল কাটিয়া বাক্স পূর্ণ করিতেছিল। বৃদ্ধা তাহাকে আমার জন্য একটি তোড়া বাঁধিতে বলিলেন।

নিকটে একখানি বেঞ্চ ছিল। বৃদ্ধা আমাকে তাহাতে বসিতে অনুরোধ করিলেন, এবং স্বয়ং উপবেশন করিলেন। আমিও বসিলাম।

দুই একটি কথার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে মহিলাটিকে আপনার সঙ্গে দেখিতে পাই, তিনি কি আপনার দুহিতা?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "মড আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী। সে আমার দুহিতার অধিক।"

"আপনার সংসারভুক্তা?"

"হাঁ। সে নহিলে আমি মুহূর্ত্ত থাকিতে পারি না। সহস্র দুঃখে সে আমার সুখ। তাহার গুণের অন্ত নাই।"

"আপনি কত দিন এখানে আসিয়াছেন?"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "সে অনেক দিন—নয় বৎসর হইল। ভগবান আমাদের দুই জনের দুঃখের জীবন এক পথে প্রবাহিত করিবার পরই আমরা এই স্থানে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর দুঃখ-বিগলিত।

তিনি পুনরায় বলিলেন, "বাবু! মড ও আমি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, আপনি এই দুঃখিনী রমণীদ্বয়ের প্রতি বিশেষ দয়া দেখাইতেছেন। আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব!"

আমি বলিলাম, "আমি শুনিয়াছি, আপনি আপনার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পত্রের আশায় পথ চাহিয়া আছেন। আমি অল্প বয়সে মাতৃহীন। মাতৃস্নেহের সুখস্বাদবঞ্চিত আমার পক্ষে জননীর বেদনা বড় দুঃখের।"

বলিতে বলিতে আমার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধা সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "বৎস, সুখ দুঃখ ভগবানের দান। দুঃখ করিয়া কি করিবে? তবে মন বুঝে না। শান্ত হও। আমার দুঃখ-কাহিনী শুনিলে তুমি হয় ত তোমার দুঃখ সহনীয় বলিয়া বিবেচনা করিবে। আমার দুঃখের কথা শুন।"

৪

বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন ;—

"আমার স্বামী সেনাবিভাগে কর্ম্মচারী ছিলেন। একটী যুদ্ধে অসাধারণ সাহস ও রণনিপুণতা দেখাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর আমার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আমার ভ্রাতাও সেনাদলে ছিলেন ; উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সে আজ পঁয়ত্রিশ বৎসরের কথা।

"বিবাহের তিন বৎসর পরে আমার পুত্র এরিক জন্মলাভ করে। সে-ই আমার সব সুখ—সে-ই আমার সব দুঃখ।

"পাঁচ বৎসর পরে আমার ভ্রাতার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে

তাঁহার মাতৃহীনা কন্যা মডকে আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। তখন মডের বয়স এক বৎসর মাত্র। আমি তাহাকে সন্তানেরই মত পালন করিতে লাগিলাম। আমার আর কোনও সন্তান হয় নাই। কিন্তু আমি একদিনও কন্যার অভাব অনুভব করি নাই। মডও আমাকে জননী জ্ঞান করিত। আমার ভ্রাতা মৃত্যুকালে কন্যার জন্য যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমার স্বামী সেই অর্থ বাড়াইবার উপায় করিলেন।

"আমার স্বামীর জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল। একদিন একখানা সংস্কৃত পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া তিনি সংস্কৃতের প্রতি অনুরক্ত হয়েন ও সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষে আসিলে সংস্কৃতচর্চ্চার সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি চেষ্টা করিয়া ভারতবর্ষে বদলী হইয়া আসিলেন। তখন এরিকের বয়স সাত বৎসর, মডের তিন। উভয়েই আমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিল।

"এরিক কিছু বড় হইলে স্বামী তাহাকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে পাঠাইতে অভিলাষী হইলেন। আমি স্নেহবশতঃ তাহাকে দূরে পাঠাইতে অসম্মত হইলাম। তিনি শেষে এরিককে ও মডকে লইয়া আমার ইংলণ্ডে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু যাঁহার বিরলপ্রাপ্ত অবসর দুর্ব্বোধ বিদেশীয় ভাষার জটিল তত্ত্বোদ্ঘাটনে নিঃশেষ হইয়া যায়, তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকের আবশ্যক। আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। শেষ এরিককে এ দেশে পড়ানই স্থির হইল।

"স্বামীর এক বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বন্ধুর পরামর্শ মতে বিশ বৎসর বয়সে এরিককে সাধারণ বিদ্যালয় হইতে ব্যবসায়-শিক্ষার্থ কলিকাতার একটি আফিসে দেওয়া হইল। দুই বৎসর পরে—সে শিক্ষিত হইলে আমাদের যাহা কিছু ছিল, সব দিয়া তাহাকে একটি হাউসে দেওয়া হইল। এরিক নিকটে রহিল; আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার স্বামীও নির্ব্বিবাদে তাঁহার পণ্ডিতদিগের সঙ্গে জীর্ণ তালপত্রের বা গলিতপ্রায় পুঁথির পাঠোদ্ধারে বা ব্যাখ্যাবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

"এক বৎসর পরে আমার স্বামীর মৃত্যু হইল। সে শোকে এরিকের অপেক্ষা মড অধিক কাতর হইয়া পড়িল।

"দারুণ শোকে এক বৎসর কাটিয়া গেল। আমার ও আমার স্বামীর ইচ্ছা ছিল, এরিক মডকে বিবাহ করিবে। তাহারাও এ কথা জানিত। বিশেষ, মড যে এরিককে অত্যন্ত ভালবাসিত, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহাতে আমি যে কত সুখী হইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। সে এরিকের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিত, এরিকের প্রত্যাবর্ত্তনকাল অতিক্রান্ত হইলে ব্যস্ত হইত; এরিকের সামান্য পীড়ায় উৎকণ্ঠিতা হইত; এমন কি, কার্য্যের ব্যস্ততাজন্য তাহার সামান্য অবহেলায় অশ্রুসংবরণ করিতে পারিত না। আমরা কতবার মনে করিতাম, ইহাদের বিবাহ হইলে আমরা আর কোনও সুখ চাহি না; কতবার পরস্পর বলিয়াছি, তাহাই আমাদের একান্ত কামনা।

"সে কামনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই স্বামী চলিয়া গেলেন। সে শোক

অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলে দেখিলাম, এরিকের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গৃহে তাহার যে প্রবল আকর্ষণ ছিল, তাহার হ্রাস হইয়াছে। নানা বন্ধুগৃহে নাচ, সমিতি প্রভৃতি ক্রমেই তাহাকে গৃহ হইতে দূরে লইয়া যাইতে লাগিল।

"শেষে একদিন আমি এরিককে স্পষ্ট বলিলাম, 'এরিক, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; পৌত্রপৌত্রীর মুখ দেখিয়া মরিতে ইচ্ছা করি।'

"এরিক বলিল, 'মা, ব্যস্ত কেন?'

"আমি বলিলাম, 'বৎস, তুমি মডকে বিবাহ করিলেই আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়।'

"এরিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, 'সে কি?'

"আমি বলিলাম, 'তোমার পিতারও এই ইচ্ছা ছিল। মড আমাদের দুহিতারই মত।'

"জানি না, কেন সহসা যেন এরিকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে নিশ্চয় আর কাহাকেও বিবাহ করিতে চাহিতেছিল। সে বলিল, 'তোমরা তাহার অর্থের জন্য এ বিবাহে এত অভিলাষী।'

"মডের প্রচুর অর্থ ছিল, কিন্তু কৈ, সে কথা ত আমাদের মনেও হয় নাই! আজ এরিকের এ কথায় আমি বড় ব্যথা পাইলাম, বলিলাম, 'এরিক! একান্ত অধঃপতিত না হইলে তুমি তোমার জনক-জননীকে এত নীচ মনে করিতে পারিতে না।'

"এরিক নির্ব্বাক হইয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'তুমি জান, মড আমার কন্যার অধিক, তোমা হইতেও অধিক প্রিয়।'

"এরিক বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, 'ভালই, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।'

"ক্রোধে আমি সে কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

"ইহার পর দুই দিন আমি এরিকের সঙ্গে কথা কহিলাম না; এরিকও আমার সঙ্গে কথা কহিল না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিলাম,— সে গম্ভীর—চিন্তিত।

"তৃতীয় দিবস সে যথাকালে আফিসে গেল; কিন্তু আর ফিরিল না। আমরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, রাত্রি হইল। সে আসিল না। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া আফিসের 'বড়সাহেবে'র নিকট পত্র লিখিলাম। তাঁহার উত্তর পাঠ করিয়া আমাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এরিক ব্যবসায়ে তাহার অংশ বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছে! সমস্ত রাত্রি আমরা দুই জন কাঁদিয়া কাটাইলাম।

"দারুণ দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল; ক্রমে দীর্ঘ দুই মাস কাটিল। এরিকের সংবাদ আসিল না। মডের দশা দেখিয়া আমি আমার দুঃখ চাপিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মডের মলিন মুখে আমি আর হাসি দেখি নাই।

"রাজধানীর ফেনিলোচ্ছল সমাজ আমাদের মত দুঃখিনী রমণীর জন্য নহে। জনসঙ্গ আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক। ছয় মাস পরে আমরা কোথাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এক জন বন্ধু

আমাদের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া এই কুটীর কিনিয়া দিলেন। আমি আমার স্বামীর বহুযত্নের ধন পুস্তকগুলি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলাম। মড কিছুতেই তাহা করিতে দিল না। কলিকাতার পোষ্ট-অফিসে ঠিকানা রাখিয়া আমরা এই স্থানে আসিলাম। সেই সব পুস্তক গৃহের অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া আছে। মড সর্ব্বদা সেই সব পুস্তক নাড়ে, ঝাড়ে, গুছায়। ঐ দেখ।”

আমি চাহিয়া দেখিলাম,—একটি কক্ষের বাতায়ন মুক্ত, কক্ষ-মধ্যে টেব্‌লে আলোক জ্বলিতেছে; মড টেব্‌লের উপর পুস্তক গুছাইতেছেন।

বৃদ্ধা পুনরায় বলিতে লাগিলেন—“মডের আগ্রহাতিশয়সত্ত্বেও আমি তাহার অর্থে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। তবে আমাদের অভাব অল্প। উদ্যানে যে আয় হয়, তাহাতেই আমাদের অভাব-মোচন হয়। আমি অধীর হইলে মড আমাকে সান্ত্বনা দেয়—এরিক নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু আমি কত দিন দেখিয়াছি, এরিকের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সাজাইবার গুছাইবার সময় সে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে।”

বলিতে বলিতে বৃদ্ধার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। আমিও চক্ষু শুষ্ক রাখিতে পারিলাম না।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশে চন্দ্রোদয় হইতেছে।

অল্পক্ষণ পরে আমি বিদায় লইলাম। বৃদ্ধা বলিলেন, “আমার ভৃত্যকে বলি, আলো লইয়া আপনাকে রাখিয়া আসুক।”

আমি ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম,"আবশ্যক নাই। চন্দ্রালোক আছে। আমি একাকী ভ্রমণ করিতে ভালবাসি।"

মালি বেঞ্চের উপর তোড়া রাখিয়া গিয়াছিল। আমি আসিবার সময় তাহা লক্ষ্য করি নাই। বৃদ্ধা আমাকে ডাকিয়া সেটি দিলেন। আমি ধন্যবাদ দিয়া গৃহাভিমুখে চলিলাম। জননীর স্নেহসিঞ্চিত ব্যাকুলতা ও যুবতীর সভক্তি প্রেমের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি আমার নির্জ্জন গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

৫

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়রযুদ্ধের অনল জ্বলিয়া উঠিল। মুষ্টিমেয় কৃষক স্বাধীনতার ও স্বদেশের জন্য সলিলের মত দেহের শোণিত ব্যয় করিয়া বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিতে লাগিল। একদিন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বৃদ্ধার নামে একটি টেলিগ্রাম কলিকাতা ঘুরিয়া আসিল।—

"এরিকের শেষ প্রার্থনা, মা ও মড ক্ষমা কর।"

পড়িয়া আমি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলাম। একবার ইচ্ছা হইল, এ সংবাদ পাঠাইব না। কিন্তু হায়, সংবাদ গোপন করি কেমন করিয়া? অগত্যা পাঠাইয়া দিলাম।

অপরাহ্নে স্বয়ং যাইয়া মালীর নিকট সংবাদ পাইলাম, টেলিগ্রাম পাইয়া বৃদ্ধা ও মড উভয়েই অধীরা। আমি ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার পর বৃদ্ধা আর ডাকঘরে আসিতেন না। আমি মধ্যে মধ্যে যাইয়া সংবাদ লইয়া আসিতাম। আমার গমনবার্ত্তা পাইলে বৃদ্ধা ও মড আমাকে ডাকিতেন। বৃদ্ধার জীবনীশক্তি দিন দিন ক্ষীণ

হইয়া আসিতে লাগিল। মড শান্ত হইয়া অক্লান্তভাবে বৃদ্ধার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। তৃতীয় সপ্তাহের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বৃদ্ধার নামে পত্র কলিকাতা ঘুরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি ডাক বাছিয়া আমি স্বয়ং সেই পত্র লইয়া বৃদ্ধার গৃহে উপনীত হইলাম। কয় দিন পূর্ব্ব হইতেই বৃদ্ধা শয্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমার গমনবার্ত্তা পাইয়া মড পার্শ্বের কক্ষে আসিলেন। তিনি কম্পিতকরে পত্রখানি খুলিলেন, কিছু দূর পাঠ করিয়া নিকটবর্ত্তী চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পার্শ্বের কক্ষ হইতে বৃদ্ধা ডাকিলেন,—"মড!" যুবতী ত্রস্তে আত্ম-সংবরণ করিয়া চক্ষু মুছিলেন, পত্রখানি পকেটে রাখিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি দ্বার হইতে আমাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

যুবতীকে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "মড! তুমি কাঁদিয়াছ।"

যুবতী নীরব রহিলেন।

বৃদ্ধা বলিলেন, "আমাকে কিছু লুকাইও না। কি হইয়াছে?"

নত-বদন হইয়া যুবতী বলিলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে পত্র আসিয়াছে।"

বৃদ্ধা সাগ্রহে বলিলেন, "পাঠ কর।"

এরিক সেনাদলে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধে গিয়াছিলেন। সেনাপতি

জননীকে তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ জানাইয়াছেন। যুবতী পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ধরিয়া আসিতে লাগিল; বৃদ্ধার পাণ্ডুর আনন আরও পাণ্ডুর হইয়া গেল।

পত্রের শেষাংশে আসিয়া যুবতী বলিলেন, "আমাদের এরিক যোদ্ধার মত—বীরের মত মরিয়াছে; অপরের প্রাণরক্ষার্থ অসাধারণ সাহস দেখাইয়া আহত হইয়াছে। সেনাপতি লিখিতেছেন, তিনি তাহাকে সৈনিকের অত্যুচ্চ পুরস্কার 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' দিবার জন্য লিখিয়াছিলেন।"

এই কথা শুনিয়া সৈনিক-সীমন্তিনীর পাণ্ডুগণ্ডে ও কপালে মুহূর্ত্তের জন্য রক্ত সঞ্চারিত হইল,—অশ্রু-সজল নয়নে আলোক ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"ভগবানকে ধন্যবাদ।"

পরদিবস ইন্‌স্পেক্টর আসিলেন। আমার আর বৃদ্ধার সংবাদ লইতে যাওয়া হইল না। তাহার পরদিবস সংবাদ লইবার জন্য যাইয়া উদ্যানের দ্বার হইতে দেখিতে পাইলাম, বিকশিত উদ্যানের এক পার্শ্বে বিধবাবেশধারিণী মড একটি সদ্যঃসমাপ্ত সমাধির শিয়রে দাঁড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।

গৃহাগত।

লোকের মুখে তিনটি অর্থশূন্য কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। সে কথা তিনটি অল্প-মূল্যের মুদ্রার মত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রচলিত; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সে কয়টির কিছুমাত্র মূল্য আছে কি না সন্দেহ; সে কথা কয়টি নিতান্তই অর্থশূন্য। লোকে কথায় কথায় "ক্ষুদ্র", "তুচ্ছ" ও "সামান্য", এই তিনটি কথার ব্যবহার করিয়া থাকে;—তিনটি কথাই প্রায় অবজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু ক্ষুদ্র কাহাকে বলি? বালুকাও ক্ষুদ্র,—হীরকও ক্ষুদ্র;—হীরক ক্ষুদ্র বলিয়া যে অকিঞ্চিৎকর মনে করে, সে হয় দেবতা; নহে ত উন্মাদ বর্ব্বর। সংসারের "ক্ষুদ্র" সুখ দুঃখ লইয়াই জীবন! তুচ্ছ কি? তোমার নিকট একটা পয়সা তুচ্ছ, কিন্তু নিরন্ন বুভুক্ষিত দরিদ্রের পক্ষে সেই একটি পয়সাই কি বহুমূল্য নহে? আজ যাহাকে তুমি তুচ্ছ ভাবিতেছ, কাল আবার তাহাই কি তোমার নিকট আদৃত হইতে পারে না! তবে "তুচ্ছ" অবস্থাভেদে,—দ্রব্য-ভেদে নহে। সামান্য বলিয়া কিছু আছে কি? এক দিনের একটা "সামান্য" কথার দাগ অনেক সময় সারা জীবনের বাক্যস্রোতে বিধৌত হইবার নহে। আয়তনে ক্ষুদ্র একখণ্ড উপলে যেমন সময় সময় নির্ঝর-নীরের পথ পরিবর্ত্তিত হয়, তেমনই সময় সময় এক একটা "সামান্য" ঘটনায় জীবনের স্রোত ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। তাই বলিয়াছি— "ক্ষুদ্র", "তুচ্ছ", ও "সামান্য",—এই তিনটি কথার অর্থ পাই না।

প্রেম-মরীচিকা।

আমি আজ আমার জীবনের যে বিবরণ বিবৃত করিতে যাইতেছি, তাহার কারণ একটি 'ক্ষুদ্র'—'তুচ্ছ'—'সামান্য' ঘটনা। কিন্তু সেই ঘটনা হইতেই এ জীবনের স্রোত ফিরিয়াছে। সেই ঘটনা হইতেই আমি ত্রয়োবিংশ বৎসর অনুসৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তে নূতন পথের পথিক হইয়াছিলাম। সেই ঘটনাটাই আমার এ ব্যর্থ জীবনের সব।

১

ম্লান কুসুমের ক্ষীণ সৌরভের মত আমার স্নিগ্ধছায়াময় পল্লীগৃহের কথা আজও মনে পড়ে—সে স্মৃতি তত উজ্জ্বল বা সুস্পষ্ট নহে, কিন্তু বড় মধুর। তখন আমি নিতান্তই বালক। সেখানে এখন আর এই শ্বেতকেশ অকালবৃদ্ধকে কে সেই চঞ্চলপ্রকৃতি বালক বলিয়া চিনিতে পারিবে? সেই চঞ্চলপ্রকৃতি বালকের শত চাঞ্চল্য ও ক্রীড়া-কৌতুকের কথা মনে করিয়া রাখিবার কেহ আর সেখানে নাই। দীর্ঘ মধ্যাহ্নে মুকুলসুরভিময় আম্রকাননে ক্রীড়া, রৌদ্রদীপ্ত দিবসে সরসীর স্বচ্ছ সলিলে সন্তরণ, তৃণশ্যাম প্রান্তরে বসিয়া অস্তগমনোন্মুখতপনকরে শোভিত, ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত অপ্সরীর অঞ্চলের মত বর্ণবৈচিত্র্যবহুল মেঘমালার শোভাদর্শন—সে সকল আজ স্বপ্নই বটে!

আমার পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। সামান্য আয়ে তাঁহাকে একটি বৃহৎ সংসার প্রতিপালন করিতে হইত। কোনরূপে আমাদের সংসার চলিয়া যাইত। আমার এক অনতিদূরসম্পর্কীয় জ্যেষ্ঠতাত

কলিকাতায় বাস করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে অযাচিতভাবে পিতাকে অর্থসাহায্য করিতেন। আমার পিতা বড় অভিমানী ছিলেন,—যেরূপ লোক ভাঙ্গিবে, কিন্তু নমিবে না,—তিনি সেইরূপ লোক ছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি জ্যেষ্ঠতাতের অর্থসাহায্য লইতে চাহিতেন না; জ্যেষ্ঠতাত জিদ করিয়া বলিতেন,—"তবে কি আমি তোমার পর?" অগত্যা পিতাকে সাহায্য লইতে হইত। এইরূপে ক্রমে সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছিল; তবুও তিনি কখনও চাহিয়া সাহায্য লয়েন নাই।

জ্যেষ্ঠতাতের অর্থের অভাব ছিল না, সম্মানের সীমা ছিল না; কিন্তু আবাসের আলোক, নয়নের আনন্দ, সৌন্দর্য্যের সার সন্তান তাঁহার ছিল না। তিনি মধ্যে মধ্যে দুই এক দিনের জন্য আমাদিগের গৃহে আসিতেন। তিনি আসিলে গ্রামে একটা 'হুলুস্থূল' পড়িয়া যাইত; পূর্ব্বে যাহারা পথে আমার পিতাকে দেখিলে চিনিতেও পারিত না, তখন তাহারাই তাঁহাকে দেখিলে নমস্কার করিয়া নিতান্ত আত্মীয়ের মত কুশলপ্রশ্ন করিত,—দুই বেলা আমাদের গৃহে যাতায়াত করিত। হায়! জগতে অর্থেরই যত আদর—মনুষ্যত্বের সম্মান নাই! তদ্ভিন্ন তখন আমাদের নূতন বস্ত্রাদি হইত; আর কয় দিন আহারের আয়োজনের আর অন্ত থাকিত না।

ভ্রাতাদিগের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছিলাম। শেষবার আমাদের বাটীতে যাইয়া কলিকাতায় ফিরিবার সময় পিতাকে বলিয়া জ্যেষ্ঠতাত আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। আমাকে আশীর্ব্বাদ

করিবার সময় মা শত চেষ্টা করিয়াও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। তখন আমার বয়স সাত বৎসর মাত্র। দরিদ্রসন্তান আমি অসীম স্নেহের অধিকারী ও অনন্যসাধারণ ঐশ্বর্য্যের ভাবী অধীশ্বর হইয়া কলিকাতায় আসিলাম। মা'র সেই অশ্রুপূর্ণ নয়ন মনে করিয়া প্রথম কয় দিন বড় কষ্ট বোধ হইত; ক্রমে সে কষ্ট আর বোধ হইত না। পিতা মধ্যে মধ্যে আমাকে দেখিতে আসিতেন; কিন্তু আমি আর কখনও পিতৃগৃহে গমন করি নাই।

২

আমাকে ঘসিয়া মাজিয়া তুলিতে প্রথমে কিছু দিন জ্যেষ্ঠতাতকে একটু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। পল্লীগ্রামের বিহগনথাঙ্কিত ধূলিময় পথ, সুমনসসুষমাকুল বকুলকুঞ্জ, কুমুদকহ্লারশোভিত দীর্ঘ দীর্ঘিকা, সেই সব বাল্যসঙ্গী,—আর সেই স্নেহশীলা জননী,—সকলের স্মৃতিতে আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত,—আমার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত। ক্রমে আমার 'চাল' বদলাইতে লাগিল। উরগ যেমন নির্ম্মোক ত্যাগ করে, আমি তেমনই আমার পূর্ব্বের সব অভ্যাস পরিত্যাগ করিলাম,—নূতন হইলাম।

আমি কিছু দিন বিদ্যালয়ে নিয়মমত অধ্যয়ন করিলাম। আমার অভিভাবক জানিতেন যে, আমার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসৃত ভ্রমাত্মক প্রথানুসারে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক; বরং তিনিই বলিতেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করা অপেক্ষা যে সমাজে তাঁহার চলা ফিরা, সেই সমাজে মিশিবার মত শিক্ষালাভ

করাই আমার কর্ত্তব্য। আমিও জানিতাম—আমার বিদ্যাশিক্ষা উদরান্নসংস্থানের জন্য নহে। কিছু দিন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর আমি গৃহে বিদ্যাচর্চ্চায় রত হইলাম। সেক্ষপিয়ারের নাটক, স্কটের উপন্যাস, বার্ণসের গীতিকবিতা, কালিদাসের কাব্য, এই সকল লইয়াই আমার সময় কাটিত। বলিতে লজ্জা করে, সেই প্রথম যৌবনে আমি অক্ষর গণিয়া, মিল খুঁজিয়া, মধ্যে মধ্যে কবিতারচনার চেষ্টাও করিতাম। তবে আমি যে বঙ্গভাষার চর্চ্চা করি, ইহা আমার জ্যেষ্ঠতাতের আদৌ অভিপ্রেত ছিল না।

জ্যেষ্ঠতাতের আশ্রিত ও অনুগৃহীতবর্গের নিকট আমার সম্মানের সীমা ছিল না। অবসরমত তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া আমি বড় আনন্দ অনুভব করিতাম। সে মেশামিশিতে একটা ভাব সুস্পষ্ট ছিল—আমি জানিতাম, আমি অনেক উচ্চে,—তাহারাও জানিত, তাহারা অনেক নিম্নে। বিদ্যায় বা বুদ্ধিতে, ধনে বা মানে, যাহারা তাহার সহিত সমস্তরে বা তাহার অপেক্ষা উচ্চ স্তরে অবস্থিত, তাহাদের সহিত মিশিয়া যুবক যত আনন্দ অনুভব করে, যাহারা তাহার অপেক্ষা নিম্ন স্তরে অবস্থিত, তাহাদের সহিত মিশিয়া সে তদপেক্ষা অনেক অধিক আনন্দ লাভ করে। তাহাতে যুবকের আত্মাভিমান তৃপ্ত হয়।

বসন্তের প্রভাতে যেমন নানা মাধুরীর মধ্যে পূর্ব্ব গগনে রবিকর ফুটিয়া উঠে, তেমনই নানা সুখের মধ্যে আমার যৌবনের রক্তকমল বিকশিত হইয়া উঠিল। আমার সুখের সীমা ছিল না।

৩

বৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতলে এক পার্শ্বের কতকগুলা কক্ষ আমার অধিকারে—আমার পাঠাগার, শয়নাগার ইত্যাদি। আমার পাঠাগারের উত্তর দিকের বাতায়ন মুক্ত করিলেই রমণী বাবুর বাটী দেখা যাইত; দুই বাড়ীর মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ গলিমাত্র ব্যবধান। রমণী বাবু মধ্যবিত্ত-অবস্থাপন্ন;—স্বয়ং কোনও সওদাগরের আফিসে চাকরী করিয়া বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতেন। তিনি বড় কুলীন; তাঁহার দুই সধবা কন্যাও সন্তানাদি লইয়া পিতৃগৃহেই বাস করিতেন।

ব্রাহ্মণের শ্রমে আলস্য ছিল না। তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহখানি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। গৃহে অধিক স্থান নাই, কিন্তু সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলার শ্রী; ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণখানিতে একখানি ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান,—যেন চিত্রে চিত্রিত; গৃহে এখানে ওখানে সঙ্গত স্থানে টবে ফুলগাছ। সবই গৃহস্বামীর শ্রমশীলতার ও রুচিপারিপাট্যের পরিচয় প্রদান করিত। আমার বহু ভৃত্যে যাহা করিতে পারিত না, ব্রাহ্মণ একাই তাহা করিতেন। আপনি করিলে কায যেমন সুসম্পন্ন হয়, ভৃত্যে করিলে তেমন হয় কি?

রমণী বাবুর একটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল। রমণী বাবু বড় কুলীন; বড় কুলীনের সমান ঘরের পাত্র পাওয়া সহজ নহে, তাই অল্প বয়সে সে কন্যার বিবাহ হয় নাই। আমার পাঠাগারের মুক্ত বাতায়নপথে আমি প্রায়ই হিমাংশুকে দেখিতে পাইতাম। যখন দেখিতাম, তরুণ অরুণের আভা তাহার মুকুলিত যৌবনমাধুরী যেন প্রস্ফুট-

তর করিয়া তুলিয়াছে, তখন কি স্বপ্নাবেশে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত, তাহা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? হৃদয়ের সে ভাব-প্রকাশের ভাষা নাই। ভাষা বাহিরের—ভাব অন্তরের। হৃদয়ের গভীর ভাব কখনও ভাষায় সম্যক্ প্রকাশিত হয় না। তাই কবিগুরু টেনিসন এক স্থানে বলিয়াছেন যে, বাক্য প্রকৃতির মত 'আত্মা'র একাংশমাত্র প্রকাশ করে, অপরাংশ অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। বিকশিত হইবার সময় বিকাশোন্মুখ কুসুম যে ভাব অনুভব করে, সে কি তাহা প্রকাশ করিতে পারে? যখন সায়াহ্নে সেই ক্ষুদ্র উদ্যান-মধ্যে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতিকার মত তাহাকে দেখিতে পাইতাম, তখন, জানি না, কি আকর্ষণ আমাকে বাতায়নের দিকে আকৃষ্ট করিত। তখন আমার মনে হইত—

"It is the east, and Juliet is the sun!"

যেমন পূর্ব্ব গগনে মেঘের উপর অরুণাভা দেখিয়া দিবাগমের আভাস পাওয়া যায়, তেমনই তাহার দীপ্ত কৃষ্ণতার নয়নের সঙ্কোচহীন দৃষ্টি দেখিয়া, আমি তাহার হৃদয়ের সরলতার ও পবিত্রতার আভাস পাইতাম।

তখন আমার বয়স তেইশ বৎসর মাত্র। প্রথমবিকশিত যৌবনে কোন্ যুবক কোন সুন্দরী কিশোরীকে ভাল না বাসিয়াছে? প্রথম যৌবনে কোন্ যুবক কোন কিশোরীকে দেখিয়া সহসা এক দিন—আপনার সমস্ত সুপ্ত অস্তিত্ব সহসা জাগরিত হইয়াছে—এইরূপ বোধ না করিয়াছে?

আমার অপরজনহীন কক্ষে বসিয়া আমি কত কি ভাবিতাম। আমি ভাবিতাম,—কুসুমের পক্ষে সৌরভ যাহা, রমণীর পক্ষে লজ্জা যাহা, বীণার পক্ষে ঝঙ্কার যাহা, বিগহের পক্ষে কাকলি যাহা, হৃদয়ের পক্ষে প্রেম তাহাই। প্রেম বিশ্বের কবিতা, প্রকৃতির মাধুরী, জীবনের সৌন্দর্য্যোচ্ছ্বাস, প্রেমই কবিতা, প্রেমই মাধুরী।

বিসপ্রসূন যেমন শরতের প্রথমরবিকরস্পর্শে প্রাণভরা সৌরভ লইয়া বিকশিত হইয়া উঠে, তেমনই সেই কিশোরীকে দেখিয়া আমার হৃদয়ের প্রেম-পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহার মধুর সৌরভে আমার সমস্ত হৃদয় আমোদিত হইয়াছিল।

আমার উচ্ছৃঙ্খল হৃদয় আপনার মধ্যে আপনি কত সুখস্বপ্ন রচনা করিত! সে সকল দিবাস্বপ্নের কি অন্ত আছে! আপনাতে আপনি নিমগ্ন হৃদয় বাস্তব সত্যের কোনও সংস্রব না রাখিয়া আপনাকে কি বিচিত্র জালেই জড়িত করিত! সে জানিত না, এতটুকু আঘাতে সে লূতাতন্তুজালের আর চিহ্নমাত্র থাকিবে না!

তখন সম্ভব অসম্ভবের দিকে চাহিবার প্রবৃত্তি বা শক্তিও বুঝি আমার ছিল না। নদী কি আপনি আপনার উপলে ব্যথিত স্রোত নিবারণ করিতে পারে? আমি তখন অন্ধ আবেগে অগ্রসর হইতেছিলাম, আমি কি আপনাকে আপনি নিবারণ করিতে পারিতাম? পারিলেও আমি বাস্তবের উজ্জ্বল আলোকে আমার হৃদয়-গগনে সে সুখকল্পনার ইন্দ্রধনু নষ্ট করিতাম না। সে আবেগ, সে উচ্ছ্বাস কি ভুলিবার?

সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদী সেই বন্ধনের কথায় সেই দূর অতীতে রচিত আমার একটি কবিতার দুইটি চরণ মনে পড়িতেছে,—

"যদি নাহি হ'ত দেখা আমাদের দু' জনায়,
তবে এ ব্যথিত হৃদি করিত না হায় হায়।"

কিন্তু থাক্; সে বিগতবাত্যাবেগ শান্ত স্মৃতিসিন্ধু আর মন্থন করিব না। কে জানে, তাহাতে অমৃত কি কালকূট উঠিবে?

৪

আমার জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর হৃদয় বড় উদার। তিনি ব্রাহ্মণগৃহিণীকে বিশেষ যত্ন ও স্নেহ করিতেন। জননীর সহিত এক এক দিন হিমাংশুও আমাদের গৃহে আসিত। এক এক দিন সন্ধ্যার পর রমণী বাবু আসিয়া জ্যেষ্ঠতাতের বৈঠকখানায় বসিতেন।

এক দিন জ্যেঠামহাশয়ের এক জন আশ্রিত আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল যে, পূর্ব্ব রাত্রিতে রমণী বাবু প্রকারান্তরে জ্যেঠামহাশয়ের নিকট আমার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; জ্যেঠামহাশয় কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার বিপুল সম্পত্তির ভাবী অধীশ্বর কোন বিশেষ ধনবানের কন্যাকেই বিবাহ করিবে। সে আমার গর্ব্ব আরও স্ফীত করিবার অভিপ্রায়ে কথাটা বলিল; কিন্তু কথাটা আমার মর্ম্মে আঘাত করিল।

দেখিলাম,—তাহার পর হইতেই গৃহে ঘটক ঘটকীর বড় গতায়াত হইতে লাগিল। শেষে একদিন জ্যেঠামহাশয় কয় স্থানে বিবাহ-

সম্বন্ধের কথা জানাইয়া আমার মতামত জানিতে পাঠাইলেন। প্রথম যৌবনে—জীবনের মধুরতম কালে কে আপনার সকল আশার বিলোপ করিতে চাহে,—কয় জন তাহা পারে? আমি আপাততঃ বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম।

সেই দিন মধ্যাহ্নে বসিবার ঘরে একখানা আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আপনার মনে কি স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করিতে-ছিলাম, এমন সময় পার্শ্বে কার্পেটে কাহার কোমল পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া চাহিলাম। জ্যেঠাইমা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "বাবা, বিয়ে করিতে চাহিতেছিস্ না কেন?" আমি নতমস্তকে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিলাম, কোনও কথা কহিতে পারিলাম না।

স্নেহার্দ্রস্বরে জ্যেঠাইমা বলিলেন, "বাবা, তুই যদি বিবাহ না করিস্, তবে আমি আর এ বিজন পুরীতে থাকিব না। তোর জ্যেঠামহাশয়ের লোকের সঙ্গে মেলামেশা আছে,—শত কায আছে, তিনি সেই সকল লইয়া থাকিতে পারেন। আমি কি লইয়া এ শূন্য পুরীতে থাকি বল? এ বাড়ী যেন হানাবাড়ীর মত বোধ হয়। যত বয়স হইতেছে, ততই যেন হৃদয়ে মহাশূন্য বোধ করিতেছি। আর একা থাকিতে পারি না। বাবা, বিবাহ কর্। আমার পেটের ছেলে নাই; কিন্তু আমি কি তোকে কখনও পেটের ছেলের অপেক্ষা কম করিয়াছি?"

হায়! বন্ধ্যা নারীর স্নেহ এমনই বটে! আমি তাঁহার নিকটে যে অকৃত্রিম স্নেহ পাইয়াছি, কয় জন জননী আপনার পুত্রকে সেরূপ স্নেহ করিতে পারেন। হায় বন্ধ্যা নারী, আপনার হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহরাশি দিয়া যাহাকে আপনার করিতে চাহিয়াছিলে, কই, তাহাকে ত আপনার করিতে পারিলে না! সে আপনি স্নেহবন্ধনে বদ্ধ হইল না—কেবল তোমার স্নেহার্দ্র কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল।

আমি মুখ তুলিয়া দেখিলাম—তাঁহার নয়নে অশ্রু। তখন আর থাকিতে পারিলাম না—হৃদয়ের কথা বলিয়া ফেলিলাম। সে স্নেহের নিকট আর লুকোচুরী করিতে ইচ্ছা হইল না।

সব শুনিয়া জ্যেঠাইমা বলিলেন, "তুই যাহাতে সুখী হইবি, তাহাতেই আমার সুখ। কর্ত্তার মত হইলেই হয়। তাঁহাকে বলিয়া দেখি।"

জ্যেঠাইমা চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—মুহূর্ত্তের আবেগে সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া কি বলিয়া ফেলিলাম! সূর্য্যাস্তকালে মেঘমালার মত আমার কল্পনা নানা ছবি গড়িতে লাগিল, ভাঙ্গিতে লাগিল।

লজ্জায়,—আশায়,—আশঙ্কায়, আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

৫

পর দিবস প্রভাতে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, জ্যেঠামহাশয় আমাকে ডাকিতেছেন। তাঁহার বসিবার ঘরে যাইয়া দেখিলাম,

জ্যেঠামহাশয় ধূমপান করিতেছেন; আরও দেখিলাম,—তাঁহার স্বভাবতঃ হাস্যোজ্জ্বল মুখ প্রলয়সহায় বজ্রসহচর পার্ব্বত্য ঝঞ্ঝার মত অন্ধকার। তিনি পার্শ্বেই একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। আমি বসিলাম।

জ্যেঠামহাশয় আমার বিবাহের কথা উত্থাপিত করিলেন। পূর্ব্ব দিন আমি জ্যেঠাইমাকে যাহা বলিয়াছিলাম, সেই কথা বলিয়া জ্যেঠামহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এই সম্পত্তি ও সম্মানের অধিকারী হইয়া তুমি দরিদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পাইবে না। ওজন বুঝিয়া চলিতে শিখ। তোমার মর্য্যাদা ভুলিও না। বড় ঘরে অনেকে তোমাকে জামাতা করিতে পাইলে কৃতার্থ হইবে। যৌবন-সুলভ 'সেন্টিমেণ্ট্যালিটি' ত্যাগ কর।"

যে আমার মত আদরে পালিত, তাহার সহিষ্ণুতা ও সংযম স্বভাবতঃই বড় অল্প হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, আমি তখন প্রেমমন্দাকিনীর প্রবল স্রোতে ভাসিতেছিলাম। আমি বলিলাম, "সামাজিক সম্মানের অপেক্ষা মনের শান্তি ও সুখ অধিক মূল্যবান নহে কি?"

জ্যেঠামহাশয় বলিলেন, "ও সব 'সেন্টিমেণ্ট্যালিটি' মাত্র। তুমি রমণী বাবুর কন্যাকে বিবাহ করিতে পাইবে না।"

আমার রাগ হইল। উচ্ছ্বসিত স্বরে আমি বলিলাম, "তবে আমি বিবাহ করিব না।"

জ্যেষ্ঠতাতের নয়ন পূর্ণোন্মুক্ত হইল। তিনি বলিলেন, "জান,—আমি তোমাকে দূর করিয়া দিতে পারি?"

ব্যথিত জনক অবাধ্য পুত্রকে যেমন করিয়া তিরস্কার করেন, জ্যেঠামহাশয় তেমনই আমাকে এ কথা বলিলেন। কিন্তু আমি তাহা বুঝিলাম না। আমি ভাবিলাম, আমি দরিদ্রসন্তান, তাঁহার অনুগ্রহদত্ত অন্নে পরিপুষ্ট ; তাই আমি তাঁহার অবাধ্য হইলে তিনি আমাকে দূর করিয়া দিবেন। আমি তাঁহার কে ? বিদ্যুৎহাস্যময়ী বর্ষা গিরিশিরে তাহার নিশীথনিবিড় কুন্তলজাল এলাইয়া দিলে যেমন এক দিন জলধরধারাপাতে পর্ব্বত-অঙ্গে শত সুপ্ত নির্ঝরের বারিরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনই তাঁহার এক কথায় আমার ষোড়শ-বর্ষের রুদ্ধ অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কম্পিতকণ্ঠে আমি কহিলাম, "আমাকে দূর করিয়া দিবার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু আমার মাথা খাইবার অধিকার আপনাকে কে দিয়াছিল ? আমি দরিদ্রসন্তান ; 'করিয়া খাইতে' পারিতাম। আপনি কেন আমার সে পথ বন্ধ করিলেন ?"

আমি এমনই আরও কি বলিতে যাইতেছিলাম ; বিবক্ষু রসনার বেগ সংবরণ করিলাম। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম ; দেখিলাম, জ্যেঠামহাশয়ের নয়ন অশ্রুপূর্ণ। তিনি আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার সেই অশ্রুর স্মৃতি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত এখনও আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।

জ্যেঠামহাশয় আমাকে ডাকিলেন। আমি ফিরিলাম না :— আপনার পাঠাগারে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। একখানা চেয়ারে বসিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিলাম ; ক্রন্দন আসিল না।

উঠিয়া ড্রয়ার খুলিয়া কবিতার খাতাখানা বাহির করিলাম—টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। ছিন্ন অংশগুলাকে একখানা জাপানী ধাতুনির্ম্মিত ট্রের উপর রাখিয়া, বাতায়নের কাছে লইয়া দেশলাই জ্বালিয়া দিলাম। প্রতিভার পরিণাম—যত্নের যাতনা,—সব পুড়িয়া গেল। কতকগুলা ভস্মীভূত কাগজের টুকরা বাতাসে উড়িয়া রমণী বাবুর গৃহপ্রাঙ্গণে ছড়াইয়া পড়িল। সেগুলার দিকে চাহিতে দেখিলাম—চঞ্চলা চপলার মত হিমাংশু উদ্যান হইতে চলিয়া গেল; এক টুক্‌রা দগ্ধ কাগজ তাহার অবেণীবদ্ধ আলুলায়িত কুন্তলে পড়িল।

তাহার পরেই আমি জ্যেষ্ঠতাতের গৃহ ত্যাগ করিলাম।

৬

বাটীর বাহির হইয়া চলিতে লাগিলাম। কোন্ দিকে যাইব—কোথায় যাইব,—কিছুই স্থির ছিল না। লক্ষ্যহীন ভাবে কিছু দূর যাইতে সহসা পরিচিত কণ্ঠে আমার নাম শুনিয়া চমকিয়া চাহিলাম। এক জন পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল; তিনি একটা প্রীতিভোজনে আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেছিলেন। আমি তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিলাম।

সন্ধ্যার পরই প্রীতিভোজনে নিমন্ত্রিতগণ বন্ধুগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আমার পূর্ব্ব সহাধ্যায়ী রমেশচন্দ্রের নিকট শুনিলাম—আর ছয় দিন পরেই তাহার সহিত হিমাংশুর বিবাহ। আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন আলোক নিবিয়া গেল। আমি

গৃহাগত।

ভাবিলাম,—এ জীবনে আমার সকল সুখ-আশা শেষ হইতে চলিল।

গভীর রাত্রিতে নিমন্ত্রিতগণ বিদায় লইলেন; কেবল আমি—শরীর ভাল বোধ হইতেছে না বলিয়া, সেখানেই রাত্রিবাস করিলাম। দারুণ দুশ্চিন্তাপীড়িত হইয়া বন্ধুগহে অনিদ্রায় আমার রাত্রি কাটিল। প্রভাতে বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় তাঁহার টেব্‌ল হইতে ইংরাজি দৈনিক প্রভাতী পত্র লইয়া উল্টাইয়া দেখিলাম। পত্রখানা রাখিবার সময় বিজ্ঞাপনের মধ্যে দেখিলাম,—জ্যেষ্ঠতাত আমাকে গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। বিজ্ঞাপনটা দেখিয়া আমার অধরপ্রান্তে অভিমানতৃপ্তির হাসি জাগিয়া উঠিল। বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া আমি একটা ইংরাজী হোটেলে আশ্রয় লইলাম। সঙ্গে যাহা আনিয়াছিলাম, তাহাতে শীঘ্র আমার অভাব হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

কয় দিন হোটেলে কাটাইলাম। রমেশের বিবাহের দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্থিরপদে পরিচিত পথে বাহির হইলাম। তখন আমার হৃদয়ে যাহা হইতেছিল, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না, তাহা "শত ক্ষুব্ধ সাগরের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস।" কিছুক্ষণ পরে রমণী বাবুর আলোকোজ্জ্বল গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তখন বর আসিয়াছে; গৃহমধ্যে কলরব উঠিয়াছে। একবার সেই গৃহের দিকে চাহিলাম,—একবার পার্শ্ববর্ত্তী পরিচিত গৃহের দিকে চাহিলাম; তাহার পর চিন্তা-তাড়িত হৃদয়ে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

সেই দিন রাত্রিকালে আমি 'পশ্চিম' যাত্রা করিলাম। ট্রেণে সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। কয় রাত্রি অনিদ্রার পর আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। প্রভাতের রবিকরে যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন শৈলসঙ্কুল প্রদেশের মধ্য দিয়া ট্রেণ ছুটিতেছে,—বঙ্গভূমির সমতল শ্যাম প্রান্তর পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি।

৭

তাহার পর সাত বৎসর দেশে দেশে ঘুরিয়াছি। শ্রম করিবার ইচ্ছা থাকিলে বঙ্গদেশের বাহিরে—ভারতবর্ষের মধ্যে লেখাপড়া-জানা বাঙ্গালী না খাইয়া মরে না। আমিও মরি নাই। তবে কাযের কোন স্থিরতা ছিল না। কিছু দিন এখানে, কিছু দিন ওখানে,—এমনই করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; স্থানপরিবর্ত্তনে হৃদয়ের জ্বালা ভুলিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছি। ইহার মধ্যে কতবার মনে হইয়াছে—জনকতুল্য জ্যেষ্ঠতাতের ও জননী অপেক্ষাও গরীয়সী জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর হৃদয়ে যে বেদনা দিয়া আসিয়াছি—আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি? তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলে তাঁহারা কি ক্ষমা করিবেন না? কিন্তু তখনই আবার মনে হইয়াছে, আজ যদি আমি ফিরিয়া যাই, তবে লোকে বলিবে, আমি সম্পত্তির আশায় ফিরিয়া আসিয়াছি,—অনাহারে শীর্ণোদর সারমেয় প্রহৃত হইয়াও উচ্ছিষ্টমুষ্টির আশায় ফিরিয়া প্রভুর পদলেহন করিতে আসিয়াছে। আমি লজ্জায় ফিরিতে পারি নাই।

ক্রমে যখন অকালে যৌবন গত হইল—অকালবার্দ্ধক্যে মস্তকের কৃষ্ণকেশরাশির মধ্যে শ্বেতরেখা দেখা দিতে লাগিল, তখন আমার মনে হইল, আমি পরলোকের যাত্রী, জাহাজে চড়িবার প্রথম ঘণ্টা হইয়াছে, তখন দেশে ফিরিবার ইচ্ছা মনে প্রবল হইতে লাগিল; যাঁহাদিগকে স্নেহ মমতার বিনিময়ে কেবল যাতনা দিয়া আসিয়াছি, তাঁহাদিগকে একবার দেখিবার ইচ্ছা সংবরণ করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। কত দীর্ঘরজনী আমি আমার স্তব্ধকক্ষে পদচারণ করিয়া কেবল দূর অতীতের কথা ভাবিয়া কাটাইয়াছি! সকল কথা মনে হইলে আমি উন্মত্তবৎ হইতাম।

এই সময় এক দিন একখানা বাঙ্গালা সংবাদপত্র আমার হাতে পড়িল। তাহাতে দেখিলাম,—কোন সদনুষ্ঠানে জ্যেষ্ঠতাতের কয় সহস্র মুদ্রা দানের কথা লিখিয়া সম্পাদক টীকা করিয়াছেন,—"দুঃখের বিষয়, দাতার শরীর বড় অসুস্থ। কিছু কাল পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রপ্রতিম ভ্রাতুষ্পুত্র নিরুদ্দেশ হয়েন। সেই পারিবারিক দুর্ঘটনা হইতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এখন তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ভগবান তাঁহাকে সুস্থ করুন।"

হায়—নির্ব্বোধ আমি কি করিয়াছি! তবে আমিই কি তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইব! কুক্ষণে তিনি হৃদয়ের রত্নাগার শূন্য করিয়া এ পিশাচকে স্নেহ দান করিয়াছিলেন; কুক্ষণে তিনি এ কালসর্প হৃদয়ে ধরিয়া পুষ্ট করিয়াছিলেন,—তখন জানিতেন না—সে-ই তাঁহাকে

দংশন করিবে,—তাহারই বিষে তাঁহাকে জর্জ্জরিত হইতে হইবে। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

আর থাকিতে পারিলাম না। সেই দিনই কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

দারুণ উদ্বেগে ও দুরন্ত দুশ্চিন্তায় সমস্ত পথ অতিবাহিত হইল।

৮

সাত বৎসর পরে সেই পরিচিত গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহের সম্মুখে রাস্তায় কয়খানি গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে—দেখিয়া বোধ হইল, চিকিৎসকের যান। গৃহ নিস্তব্ধ;—ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে গুমটের মত যেন কোন দারুণ দুর্ঘটনার পূর্ব্বলক্ষণ স্তব্ধতায় গৃহ সমাচ্ছন্ন। আশঙ্কায় আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম।

প্রবেশকক্ষের দ্বারদেশেই জ্যেঠামহাশয়ের বৃদ্ধ ভৃত্য ভগবান বসিয়া ছিল; তাহার মুখ ম্লান,—চক্ষুতে অশ্রু। তাহাকে দেখিয়াই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভগবান, খবর কি?"

ভগবান স্ত্রীলোকের মত কাঁদিয়া উঠিল; বলিল, "বুঝি আপনাকে দেখিবার জন্যই এখনও প্রাণ বাহির হয় নাই। কালও জ্বরের ঘোরে কেবল আপনার কথা বলিয়াছেন। যদি এক দিন আগে——"

আর শুনিতে পারিলাম না; উন্মত্তের মত দ্বিতলে উঠিয়া একেবারে জ্যেঠামহাশয়ের শয়নকক্ষে ছুটিয়া চলিলাম। পথে একটা

ঘরে দেখিলাম, কয় জন ডাক্তার বসিয়া আপনাদের মধ্যে গল্প করিতেছেন ও অনুচ্চ স্বরে হাসিতেছেন।

আমাকে দেখিয়া জ্যেঠাইমা কাঁদিয়া উঠিলেন,—"এত দিনে আসিলি বাবা? আর দেখা হইল না!"

আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে রোগীর শয্যার শিয়রে বসিয়া প্রাণের আবেগে ডাকিলাম,—"জ্যেঠা-মহাশয়!" অশ্রুর উচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠস্বর অর্দ্ধস্ফুট ক্রন্দনের মত হইয়া আসিতেছিল। বুঝি সে স্বর সেই স্নেহময় হৃদয়ের রুদ্ধপ্রায় স্পন্দনতন্ত্রীতে আঘাত করিল,—বুঝি এ হতভাগ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহার বিলুপ্তপ্রায় মানসী শক্তি একবার সচেতন হইয়া উঠিল;—বুঝি তিনি আমাকে চিনিলেন। মুমূর্ষুর নয়নদ্বয় একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার একখানি হস্ত আসিয়া আমার ক্রোড়ে পড়িল। কিন্তু আর কথা ফুটিল না। আমি সেই হস্তখানি সযত্নে নিজ হস্তে তুলিয়া লইলাম।

তাহার পর সব ফুরাইল।

* * * * *

জ্যেঠামহাশয়ের বাক্সে তাঁহার উইল পাইলাম। তাহার মর্ম্ম এই যে, জ্যেঠাইমা কেবল নির্দ্দিষ্ট মাসহারা পাইবেন; আমিই সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। যদি আমার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে আমার পুত্রকন্যা থাকিলে তাহারাই সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। যদি পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমার, বা আমার পুত্র কন্যা কাহারও

সন্ধান না হয়, সম্পত্তি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সদনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইবে।

এ সম্পত্তি লইয়া আমি কি করিব? যত দিন আমার জননী-প্রতিমা জ্যেঠাইমা জীবিতা আছেন, তত দিন জীবনে আমার আকর্ষণ আছে—সংসারে আমার বন্ধন অছে। তাহার পর আমি সকল আকর্ষণহীন,—সর্ব্ববন্ধনবিহীন। তবে এ সম্পত্তি লইয়া আমি কি করিব?

এ সম্পত্তি জ্যেঠামহাশয়ের কল্পিত সদনুষ্ঠানেই অর্পিত হইবে। যাহাতে তাঁহার সেই সকল কল্পিত অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারি, আমি তাহাই করিব, এবং আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যত দূর কুলায়, তাহাতেই সাহায্য করিব। আমি জানি,—সে বৃহদনুষ্ঠানে আমার মত অধমের সাহায্য সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্যের অপেক্ষা অধিক হইবে না। তাহাতে সে অনুষ্ঠানের কোনরূপ অনুভবযোগ্য সাহায্য হইবে কি না সন্দেহ, কিন্তু জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্কল্পিত মহদনুষ্ঠানে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছি জানিলে, আমি আমার এই তাপতপ্ত জীবনের সায়াহ্নে কিছু তৃপ্তিলাভ করিতে পারিব না কি?

মৃত্যু-ভয়।

১

"স্নিগ্ধ-শোভন, হৃদিরঞ্জন জ্যোৎস্নাযামিনী তুমি ;
শিশির-অন্তে নব বসন্তে উজ্জ্বল বনভূমি ;
অরুণ-কিরণে সরসী-জীবনে বিকশিত শতদল ;
মলয়-বীজনে বিকশিত বনে পিকের প্রণয়-কল ;
বরষার শেষে শরৎ-আকাশে উষার কনক কর ;
গন্ধ-মোদিত, কোকিল-কুজিত নিশীথে বাঁশরী-স্বর ;
নব-বিকশিত-কুসুমে শোভিত শিশির অরুণ করে ;
সুখদ-পরশ মলয় সরস নীরস শীতের ঘরে ;
শিশিরের শেষে অভিনব বেশে প্রকৃতির নব শোভা ;
বাত্যা-বিগত গগনে উদিত চন্দ্র লোচন-শোভা।
পূর্ণ হৃদয় শুধু তোমাময়, তোমা ছাড়া নাই আর ;
তোমার বিহনে শূন্য জীবনে উঠে শুধু হাহাকার ;
তোমার নয়নে প্রেমের কিরণে নিবিড় আঁধার টুটে ;
শুষ্ক এ বুকে সীমাহীন সুখে আকুল পুলক ফুটে।"—

"নীরস শীতের ঘরে"—"নীরস শীতের পরে" কোন্‌টি ভাল, কবিতা লিখিয়া সতীন্দ্রনাথ তাহাই ভাবিতেছিল। তখন রাত্রি প্রায় দশটা। শয়নকক্ষে প্রশস্ত পালঙ্কে অতি কোমল শুভ্র শয্যা রচিত রহিয়াছে। তাহারই নিকটে—জরীর কায করা আস্তরণে আবৃত টেবলে রিডিং-

ল্যাম্প হইতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক উদ্গিরিত হইয়া কক্ষ আলোকিত করিতেছে। সেই টেব্‌লের সম্মুখে মরক্কো-চর্ম্মমণ্ডিত চেয়ারে বসিয়া সতীন্দ্রনাথ ভাবিতেছে। তখনও কলম হাতেই রহিয়াছে।

এমন সময় তাহার 'তুমি' কক্ষে প্রবেশ করিল। পত্নীর পদ-শব্দে সতীন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিল। পত্নী শৈলবালা গ্রীবা একটু বাড়াইয়া, নয়নদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া দেখিল,—স্বামী কবিতা লিখিয়াছেন। সে কিছু না বলিয়া শয্যায় যাইয়া শয়ন করিল।

সতীন্দ্র জানিত, শৈল কবিতা বড় ভালবাসে; সে ভাবিয়াছিল, শৈল নিশ্চয়ই কবিতা শুনিতে চাহিবে, এবং তাহারই উদ্দেশে লিখিত কবিতা শুনিয়া প্রীতা হইবে। তাই সে প্রথমেই বলে নাই, "শৈল, আজ একটা কবিতা লিখিয়াছি।"

প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল। সতীন্দ্রের বোধ হইল, অনেক-ক্ষণ হইয়াছে। সে সতর্ক হইয়া একবার শয্যায় পত্নীর দিকে চাহিল। বোধ হইল, যেন শৈল ঘুমাইয়াছে। তখন আর 'ঘরে' ও 'পরে'র শ্রেষ্ঠত্ব-বিচারে তাহার মন রহিল না। সে দুইবার মৃদুস্বরে ডাকিল,—"শৈল!" শৈল উত্তর দিল না। সতীন্দ্র অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে ডাকিল। তবুও উত্তর নাই। তখন আপনার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া সতীন্দ্রনাথ যাইয়া পত্নীর কপোলে করতল স্পর্শ করিল। শৈল উঠিল না। যে সত্য সত্যই ঘুমায়, সে সহজে জাগে; কিন্তু যে কপট নিদ্রায় অভিভূত, তাহার নিদ্রাভঙ্গ সহজে হয় না। শৈল উঠিল না। সতীন্দ্রের মন ভারাক্রান্ত হইল।

পত্নীর কপালের কয় গুচ্ছ কেশ তাহার সযত্ন-রচিত কবরীতে বদ্ধ হইত না। শৈলবালার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহারা সত্বর আবশ্যক দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হয় নাই। সতীন্দ্র সেগুলিকে সরাইয়া পত্নীর কর্ণের পশ্চাতে স্থাপন করিল; তাহার পর তাহার কপোল চুম্বন করিল।

আলোক নিবাইয়া আসিয়া সতীন্দ্র শয়ন করিল। সে অল্প-ক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বামীর গভীর ও নিয়মিত নিশ্বাস-প্রশ্বাস-শব্দে শৈল বুঝিল, সতীন্দ্র ঘুমাইয়াছে। সে ধীরে ধীরে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল; দেখিল, সত্যই সতীন্দ্র ঘুমাইয়াছে! সে ভাবিল, এত শীঘ্র এত নিদ্রা! কৈ, সে ত এখনও ঘুমায় নাই!

পরদিবস প্রভাতে উঠিয়াই সতীন্দ্র পত্নীকে জাগাইল; বলিল, "শৈল, কাল একটা কবিতা লিখিয়াছি।"

শৈল কিছু বলিল না। সে উঠিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। সে ভাবিল, গত রাত্রিতে সে আসিবামাত্র সতীন্দ্রের সে কথা বলা উচিত ছিল।

সমস্ত দিন সতীন্দ্রের মনে যেন ভার চাপিয়া রহিল।

২

সতীন্দ্রনাথের মনে কেবল যে একটা-ভারই চাপিয়া রহিল, এমন নহে। বর্ষার আকাশে যেমন মেঘের সঙ্গে সঙ্গে জ্বালাময়ী বিদ্যুল্লতাও থাকে, তেমনই তাহার হৃদয়ে আশঙ্কাও রহিল। মনের সে ভার প্রণয়পাত্রীর মনোবেদনা-হেতু। সতীন্দ্রনাথ পত্নীকে অত্যন্ত

ভালবাসিত। তখনও তাহাদের সন্তান হয় নাই। সতীন্দ্রনাথের হৃদয়ে পত্নী ব্যতীত আর কাহারও স্থান ছিল না। সতীন্দ্রনাথের সকল আশা ও সকল কল্পনার কেন্দ্র সেই পত্নী। কিন্তু আশঙ্কার কারণ অন্যবিধ।

সতীন্দ্রনাথ জানিত, তাহাকে লইয়া শৈল সুখী নহে। কেন? তাহা সে জানিত না; জানিলে হয় ত কারণ দূর করিতেও পারিত। শৈল যে তাহাকে ভালবাসে নাই, এমন নহে। বিবাহের পর প্রথম প্রণয়বিকাশকালে সতীন্দ্রনাথ মনে করিয়াছিল, সে পত্নীর নিকট যে প্রেম পাইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। সেই প্রেমস্মৃতিই বহুদিন তাহার সর্ব্বসুখের আকর ছিল। কিন্তু তাহার পর সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে শৈল তাহা স্বীকার করে না। কিন্তু যে সত্য সত্যই ভালবাসে, তাহার হৃদয়ে প্রেমাস্পদের হৃদয় প্রতিবিম্বিত হয়; তাই শৈল তাহা স্বীকার না করিলেও, সতীন্দ্রনাথ তাহা অনুভব করিত।

সতীন্দ্র প্রথমে মনে করিত, সংসারে পত্নীর মন বসিলে তাহার এ ভাব যাইবে। শৈল সংসারের সব কায নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিত। কিন্তু সে সংসারের কায লইয়া থাকিত না। সে সব কায যেন সখ করিয়া করা। সন্তান হইলে হয় ত শৈলবালার এ ভাব দূর হইত। কিন্তু শিশুর হাসিমুখে স্বামীস্ত্রীর দাম্পত্যজীবন সুখসমুজ্জ্বল হয় নাই।

সাধারণতঃ স্ত্রী স্বামীর সকল খুঁটিনাটি যেমন করিয়া লক্ষ্য করে,

স্বামী স্ত্রীর সকল খুঁটিনাটি তেমন করিয়া লক্ষ্য করে না। তাহার কারণ, স্বামীর অনেক কাযই গৃহের বাহিরে। স্ত্রী তাহাকে যে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করে, তাহার কার্য্য তাহাকে সর্ব্বদাই সেই সীমার বাহিরে লইয়া যায়। স্ত্রীর সর্ব্বদাই মনে হয়, স্বামীকে পর্য্যাপ্তপরিমাণে পাইলাম না। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে হারাইবার ভয় থাকে—তাই স্ত্রীর এত চেষ্টা। স্বামীর পক্ষে তাহা নিতান্ত অনাবশ্যক। কারণ, তাহার পক্ষে হারাইবার কোনও আশঙ্কাই নাই। বিশেষ, চিরাগত অটল বিশ্বাসে স্বামী নিশ্চিন্ত থাকে, সে-ই তাহার পত্নীর সর্ব্বস্ব। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। শৈল স্বামীর প্রেমে অটল বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত ছিল কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু সতীন্দ্র যে নিশ্চিন্ত ছিল না, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তাহার প্রধান কারণ, মানবজীবনে মানবমাত্রেরই স্বভাবতঃ যে আকর্ষণ থাকে, সতীন্দ্র ভাবিত, তাহার পত্নীর তাহা নাই। কেন নাই—কেন সে পত্নীর প্রতি তাহার সকল কর্ত্তব্য পালন করা সত্ত্বেও,—সে পত্নীকে হৃদয়ের প্রেম দিয়া তাহাকে হৃদয়-সর্ব্বস্ব করিলেও, শৈল সুখী হয় নাই, সতীন্দ্র সর্ব্বদাই তাহা ভাবিত। সে ভাবিত, আর শঙ্কিত হইত,—না জানি তাহার অদৃষ্টে দুঃখ-দুর্দ্দশার কি দুরন্ত দাবানল জ্বলিবে!

পত্নীর কথায় ও কার্য্যে সতীন্দ্র কেবল এইটুকু বুঝিয়াছিল, শৈলবালার বিশ্বাস,—সে স্বামীর সমস্ত প্রেম পায় নাই! ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সতীন্দ্র ভাবিত, সে পত্নীকে জীবন-সর্ব্বস্ব করিয়াছে,

তবুও তাহার মনে এ সন্দেহ কেন? কেমন করিয়া—আর কি করিয়া সে পত্নীর সন্দেহ ঘুচাইবে? তাহার স্বভাবে বা কার্য্যে, ব্যবহারে বা আচরণে, কিসে পত্নীর হৃদয়ে এ সন্দেহ জন্মিয়াছে? কিন্তু ইহার জন্যও সে পত্নীকে দোষী করিত না, বরং ভাবিত, তাহার অবশ্যই কোন দোষ আছে। প্রেম এমনই বটে!

আজ সতীন্দ্র আপনাকেই দোষী স্থির করিল। চপলতা, কৌতুকপ্রিয়তা যৌবনের সহচর। কিন্তু একের পক্ষে যাহা পথ্য, অপরের পক্ষে তাহা অনিষ্টকর যে না হয়, এমন নহে। যাহার যাহা সহে না, তাহার তাহা না করাই কর্ত্তব্য। সে পত্নীকে জানিয়াও কেন পূর্ব্বেই তাহাকে কবিতারচনার কথা বলে নাই? সে আপনা-কেই দোষী মনে করিল।

ইহার পর সতীন্দ্র আরও একবার শৈলকে কবিতার কথা বলিল; শৈল সে কথায় কানই দিল না।

এই অতিতুচ্ছ ঘটনা হইতেও অঘটন ঘটিয়া গেল। স্বামীর মনে দুঃখ ও আশঙ্কা জন্মিল; স্ত্রীর আহত চিত্তও অভিমানে ভারা-ক্রান্ত হইয়া রহিল। অদৃষ্টের এমনই উপহাস।

৩

যেরূপ তুচ্ছ ঘটনায় স্বামীস্ত্রীর মধ্যে এই মনোমালিন্যের সঞ্চার হইল, এরূপ তুচ্ছ ঘটনা প্রায়ই ঘটে। সচরাচর তাহাতে দম্পতিকলহে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়; স্নেহের আদরে, সোহাগের বিদ্রূপে, প্রেমের চুম্বনে অভিমান ভাসিয়া যায়—কুজ্মটিকার পর সমুদিত সূর্য্যের

মত প্রেম যেন সমুজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। বরং মান অভিমান প্রেমের পক্ষে স্বাভাবিক—তাহাতে প্রেমের মাধুরী বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু নদীর স্রোতে একবার পলি জমিয়া যদি চর পড়িতে আরম্ভ হয়, তবে প্রতিহতবেগ প্রবাহে বাহিত সামান্য পলিও তাহাকে ক্রমেই বর্দ্ধিতায়তন করিতে আরম্ভ করে। একবার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইলে বিপদের আর অন্ত থাকে না। এ স্থলেও তাহাই হইয়াছিল। কথায় কথায় শৈলবালার মন ভারি হইত; জীবনে বিতৃষ্ণার কথা প্রকাশ পাইত; সঙ্গে সঙ্গে বেদনায় ও আশঙ্কায় সতীন্দ্রনাথের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। প্রথমে সে বিপদের অন্ধকারে আশার যে কিরণরেখা দেখিতে পাইত, ক্রমে তাহা ক্ষীণ হইতে লাগিল। শেষে বুঝি জীবন অন্ধকার করিয়া তাহার জ্যোতি নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। কিন্তু তখনও শৈলবালার প্রতি প্রগাঢ় প্রেমে সতীন্দ্রনাথের ব্যথিত হৃদয় পূর্ণ। সেই ত যন্ত্রণার কারণ। সতীন্দ্র সর্ব্বদাই ভাবিত,—কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিত না;—কেবল ভাবিত। তাহার হৃদয়ে কেবল আশঙ্কার দারুণ চাঞ্চল্য। জীবনে সুখ কোথায়?

যে সুখের আশায় মানুষ আর সব সুখ ত্যাগ করিতে পারে, সে সুখের আশায় হতাশ হইলে মানুষের বড় বেদনা, বড় যাতনা। মানুষ পত্নীর নিকট যত আশা করে, তত আর কাহারও নিকট করে না। পত্নীর প্রেমে যাহার হৃদয় সুখ-সুরভিত হয় নাই, তাহার জীবন বড় দুঃখের। পত্নীর প্রেমে যাহার হৃদয় পূর্ণ হয় নাই,

তাহার শূন্য হৃদয়ে কেবল যাতনা। যে পত্নীর প্রেমে সব কষ্ট ভুলিতে না পারে, সে বাঁচিয়া থাকে কেন? পত্নীর প্রেমে যদি দুঃখ থাকে, তবুও সুখের তুলনায় সে দুঃখ নিতান্তই নগণ্য। দাম্পত্য জীবনে যদি বেদনা—যাতনা থাকে, তবুও সুখের কুসুমে সে মরুভূমি চির-প্রফুল্ল হইয়া থাকে। পত্নীর প্রেম জীবনে অনন্ত সুখের আকর। যে তাহা পায় না, তাহার বড় দুঃখ। যে তাহা পাইয়াও পায় না, তাহার আরও দুঃখ। সতীন্দ্রনাথের তাহাই হইয়াছিল। সে যে প্রেম হৃদয়ের সুখ ও জীবনের নির্ভররূপে গ্রহণ করিয়াছিল, সে প্রেমে এত দুঃখ কেন? যে পত্নীকে সে হৃদয়-সর্ব্বস্ব করিয়াছিল, তাহার মনে এ দারুণ সন্দেহ কি জন্য?

কবিতার চর্চ্চায় ও কবিতার রচনায় সতীন্দ্রনাথের স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ হৃদয় আরও ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল। পত্নীর এইরূপ ব্যবহারে সে অত্যন্ত ব্যথিত হইত।

পত্নীর এইরূপ ব্যবহারে প্রথমে তাহার হৃদয়ে বেদনাই প্রবল হইত—তাহাতে আশঙ্কা তত প্রবল ও প্রদীপ্ত হইত না। কিন্তু ক্রমে বেদনা ও আশঙ্কা সমান হইতে লাগিল। শেষে বুঝি আশঙ্কা বেদনাকেও অতিক্রম করিয়া গেল—আশঙ্কা ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সত্যই কি তাহার জীবনে অতি দারুণ, কল্পনারও অতীত দুর্ঘটনা ঘটিবে? সত্যই কি পত্নীর এ ভাব, এ বিশ্বাস দূর হইবে না? সত্যই কি শৈলবালার জীবনে বিতৃষ্ণা অপনীত হইয়া জীবনে আকর্ষণ জন্মিবে না?

সতীন্দ্রনাথের স্বভাবতঃ সুস্থ শরীরে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না বটে, স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল না সত্য, কিন্তু সর্ব্বদা শঙ্কিত অবস্থায় অবস্থান করিয়া তাহার স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সে সামান্য বেদনা একান্ত অসহনীয় বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

ইহার বিষময় ফলের কথা শৈল বুঝিতে পারিত না। স্বামীর অকারণ ব্যস্ততায় সে যদি বা কৌতুক বোধ না করিত, বিচলিত হইত না। ভাবনায় ভাবনা বর্দ্ধিত হয়। এক বিষয় একভাবে ভাবিতে থাকিলে, শেষে তাহার ভাবান্তরের কথা আর কল্পনাতেও আসিতে চাহে না। আপনার কল্পিত দুঃখকে সত্য ভাবিতে ভাবিতে শেষে শৈলবালার নিকট তাহা একান্ত দুঃসহ বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। সে সত্য সত্যই ভাবিতে লাগিল, সে তাহার প্রাপ্য পায় নাই ; সুতরাং তাহার জীবন কেবল দুর্ব্বহ যাতনামাত্র। এ জীবনের, এ যাতনার ভার বহিয়া লাভ কি ? কেন সে জীবন রাখিবে ?

৪

ক্রমাগত আপনার কল্পিত দুঃখের কথা চিন্তা করিয়া শৈলবালার সে দুঃখ যে পরিমাণ দুঃসহ বোধ হইতেছিল, তাহার জীবনের প্রতি আকর্ষণও সেই পরিমাণে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। সহস্র দুঃখ দুর্দ্দশাতেও জীবনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে! সাময়িক উন্মত্ততার উত্তেজনাই আত্মনাশের কারণ। ভ্রান্ত বিশ্বাসের কুজ্ঝটিকায় শৈল আর সে আকর্ষণ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

শৈল যদি একবার ভাল করিয়া স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া

দেখিত, তবে তাহার কল্পিত দুঃখকে অসার বুঝিতে না পারিলেও, সহনীয় মনে করিত। জগতে কল্পিত সুখলাভ কাহার ভাগ্যে ঘটে? যাহা পাই না, তাহার জন্য সব ত্যাগ না করিয়া, জীবনের কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত না হইয়া, যাহা পাইয়াছি, তাহারই সম্যক সদ্ব্যবহার করিয়া, আপনাকে ও আপনার জনকে সুখী করিবার চেষ্টাতেই মনুষ্যত্ব। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে শৈল এ কথা বুঝিতে পারিত; আরও বুঝিত, জগতে অনেক রমণীর অপেক্ষা সে সুখী। নিষ্কলঙ্ক পূতচরিত্র স্বামীর প্রেম সে পাইয়াছিল,—ভ্রান্তি-বশতঃ শৈল তাহা লক্ষ্য করে নাই। লক্ষ্য করিলে সে আপনাকে দুঃখী না ভাবিয়া সুখী ভাবিত। সে কেন তাহা লক্ষ্য করে না, সতীন্দ্র তাহাই ভাবিত।

সময় সময় পত্নীর জীবনে বিতৃষ্ণা এমনই প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিত যে তাহাকে শান্ত করিবার জন্য অবলম্বিত উপায়ে সতীন্দ্র আপনি সঙ্কুচিত হইত; তাহার আত্মসম্মান আহত হইত; সম্ভবতঃ তাহাতে শৈলবালারও বিরক্তি ও ঘৃণা বর্দ্ধিত হইত।

এক এক দিন সতীন্দ্রনাথ পত্নীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত। বিষয়গুণে গাম্ভীর্য্য আপনি আসিত—বিশেষ তাহার হৃদয়াবেগ প্রত্যেক কথায় ফুটিয়া উঠিত। সতীন্দ্রনাথ এরূপ উপদেশ দিলে শৈল কখন কখনও স্থির হইয়া তাহার সকল কথা শুনিত; কিন্তু এক এক দিন উপেক্ষার হাসিও হাসিত। সে হাসিতে সতীন্দ্রনাথের ব্যথিত হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তাহার হৃদয়ের দুঃসহ দুঃখ জ্বালাই

কি যথেষ্ট ছিল না? আবার কেন সে ইচ্ছা করিয়া এ উপহাসের ভাগী হইতেছে? সে আপনাকে ধিক্কার দিত—জগৎকে ধিক্কার দিত। সে কি করিবে, স্থির করিতে পারিত না। কিন্তু হৃদয়ের সে অবস্থায় কোনও কার্য্য করা অসম্ভব। এক এক দিন যেন পত্নীর জীবনে বিতৃষ্ণা—জীবনদীপনির্ব্বাপণের বাসনা স্বামীতেও সংক্রান্ত হইত।

এক এক দিন উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে সতীন্দ্রনাথ পত্নীকে কত কথা বলিবে, স্থির করিয়া রাখিত। কিন্তু সাক্ষাতে পত্নীর উপহাস-দীপ্ত দৃষ্টি ও আবেগহীন কথার ফলে তাহার কথা আর ফুটিত না। মনের কথা মনেই রহিয়া যাইত—কেবল তাহাকেই যন্ত্রণা দিত। সে আপনার জ্বালায় আপনি জ্বলিত।

এমনই ভাবে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

ইহার মধ্যে এক এক দিন আসন্ন বিপদের নিবিড় ছায়ায় সতীন্দ্রনাথের হৃদয় অন্ধকার হইয়াছে। যদি বা কখন সে অন্ধকারে বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে, অন্ধকারাবসানে ঊষালোকবিকাশের শেষ সম্ভাবনাও আর সম্ভব বলিয়া বোধ হয় নাই।

সতীন্দ্রনাথ কোনরূপে পত্নীর জীবন রাখিয়াছে—তাহাকে আত্মঘাতিনী হইতে দেয় নাই। কিন্তু সে তাহাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া ফিরাইতে পারে নাই—কাযেই কোন স্থায়ী ফললাভ হয় নাই। কেন এমন হইয়াছিল, সতীন্দ্রনাথ তাহা ভাবিয়া পাইত না। প্রথমে সে আশা করিত, একদিন শৈল স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিবে। কিন্তু হায়!—সে একদিন আর আসিল কৈ? সে একদিনের আগমন-

সম্ভাবনা ক্রমে সুদূরপরাহত হইয়া শেষে অসম্ভবেই পরিণত হইয়াছিল। তাহার জীবন আশার শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। তাহার মত দুঃখ কাহার?

আশা যখন নিবিয়া যায়, তখন জীবনে কেবল দুঃখ—কেবল যাতনা। সতীন্দ্রনাথের জীবনে তাহাই হইয়াছিল। সে নির্দ্দোষ হইয়াও দোষী, সে প্রেম দিয়াই অপরাধী, সে ভালবাসিয়াই লাঞ্ছিত। তবুও ভালবাসা যায় না—প্রেম অমর। তাই সতীন্দ্রনাথের যাতনা।

৫

পুরুষের নানা জ্বালা। সংসারের ভাবনাই তাহার একমাত্র ভাবনা নহে—যাহারা তাহার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের চিন্তাই তাহার একমাত্র চিন্তা নহে। কর্ত্তব্যের কঠোর শাসন অনেক সময় অপ্রীতিকর, দুঃসহ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা,—তাহাকে বড় দুঃখেও হাসিতে হয়; হৃদয়ভাব গোপন করিয়া সমাজে মিশিতে হয়; লোকের সঙ্গে সহজ সামাজিক ব্যবহার করিতে হয়; লক্ষ্য রাখিতে হয়,—সে দুঃখ, সে কষ্ট কেবল তাহারই আপনার, অপরে তাহা জানিতেও না পারে। এই প্রকৃত মনোভাবগোপনের দারুণ কষ্ট পুরুষকে পদে পদে সহ্য করিতে হয়। হায়!—কত দুঃখের—কত কষ্টের অংশ পুরুষ পত্নীকে পুত্রকেও দিতে পারে না; হয় ত তাহাতেও তাহার আত্মাভিমান আহত হয়,—হয় ত সে তাহাদের হৃদয়ে বেদনাসঞ্চারের আশঙ্কাতেই সমস্ত দুঃখ, সকল

কষ্ট আপনি সহ্য করে,—কাহাকেও সে সকলের অংশ দেয় না। যখন শত দুঃখকষ্টের দারুণ শরশয্যায় জীবন নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আইসে—যন্ত্রণার অন্ত থাকে না, তখনও পুরুষকে স্বজনগণের সহায়তা হইতে স্বেচ্ছায় আপনাকে বঞ্চিত করিতে হয়। ইহাই পুরুষের জীবন।

সতীন্দ্রকে এই জীবন যাপন করিতে হইত। হৃদয়ে দুঃসহ দুঃখজ্বালা, কিন্তু সংসারের ও সমাজের সব কর্ত্তব্যই সম্পন্ন করিতে হইত। হাসির মিথ্যা আবরণে অশ্রু আবৃত করিতে হইত। আবার সেই জন্যই শৈল বিশ্বাস করিত না যে, তাহার স্বামী সত্য সত্যই দুঃখিত—সত্য সত্যই চিন্তিত;—সত্যই তাহার জন্য স্বামীর চিন্তার অবধি নাই। বরং সে মনে করিত, সতীন্দ্রনাথ তাহার নিকট প্রকৃত কথা কহে না; সে যে প্রেম জানায়, তাহা সত্য নহে;—যে দুঃখের কথা বলে, তাহার মূল নাই। সে পুরুষের শত জ্বালার কথা বুঝিত না; তাহার বিশ্লেষণ করিতে পারিত না; প্রকৃত ও অপ্রকৃত চিনিতে পারিত না।

অবিরত দারুণ দুশ্চিন্তায় ও আশঙ্কায় সতীন্দ্রনাথের স্নায়বিক বিকার ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। সামান্য চিন্তায় চিত্ত একান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে; সমস্ত দিন মন চঞ্চল থাকে—কিছুতেই শান্ত হয় না। সামান্য কারণে আশঙ্কার আর অবধি থাকে না। অকারণেও আশঙ্কা জন্মে। বিশেষতঃ শৈলবালার সামান্য চাঞ্চল্যে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে—তাহার সকল ব্যবহারেই যেন আশঙ্কার কারণ উপলব্ধি করে।

দিবসে দুশ্চিন্তা—নিশায় দুঃস্বপ্ন। সে রাত্রিকালে উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া দেখে,—শৈল জাগিয়া, কি ঘুমাইয়া,—সে কি করিতেছে।

তাহার এইরূপ ব্যবহারে শৈল হাসিত। সতীন্দ্রনাথ মনে করিত, এই হাসির আবরণে শৈল তাহার মনোভাব—চাঞ্চল্য গোপন করিতেছে, তাহাকে প্রতারিত করিতেছে। তখনই মনে পড়িত, পত্নীর সরস ওষ্ঠাধরে হাস্যে তাহার কি আনন্দ ছিল; সে ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটাইতে তাহার কত আগ্রহ ছিল! হৃদয় ব্যথিত হইত—নয়নে অশ্রু আসিত। হায়!—সব যায়, তবু প্রেম যায় না। আজও তাহার ব্যথিত হৃদয় হইতে সে আগ্রহ যায় নাই; কিন্তু তাহা ফুটিতে না ফুটিতে আশঙ্কার দারুণ তাপে ম্লান হইয়া যায়।

সহসা পত্নীর পদশব্দ শুনিলে সতীন্দ্র চমকিয়া উঠিত—অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার কাতর হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত।

এমনই ভাবে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। দারুণ দুর্দ্দশা প্রশমিত হইল না, বরং বাড়িতে লাগিল। আর মনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক নিস্তেজতাও ক্রমে বাড়িতে লাগিল। জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল।

৬

রজনীর প্রথম যাম অতিক্রান্ত হইয়াছে। সতীন্দ্রনাথ শয়নকক্ষে বসিয়া আছে। এক জন আত্মীয় পূজার ছুটীতে 'পশ্চিমে' গিয়াছেন। তাঁহার দ্রব্যাদি গুছাইতে—ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে সমস্ত দিন গিয়াছে। শ্রান্তদেহে সে সন্ধ্যার পর গৃহে

ফিরিয়াছে। কিন্তু আসিয়া দেখিয়াছে, পত্নীর মুখ অন্ধকার। সে কারণানুসন্ধান করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছে। তাই আজ শ্রান্তি-হেতু নয়ন নিদ্রাজড়িত হইয়া আসিলেও সে শয়ন করে নাই; জাগিয়া বসিয়া আছে—কি জানি কি ঘটে!

শৈল শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; শয্যায় শয়ন করিল। সতীন্দ্র বলিল, "দীনেশ দাদাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছি। এত জিনিস লইয়া লোক বেড়াইতে যায়!"

শৈল কোন কথা কহিল না।

সতীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি তোমার শরীর ভাল নাই?"

শৈল বলিল, "কেন?"

"মনে করিতেছি, কল্য তোমাকে শিবপুরের বাগানে বেড়াইতে লইয়া যাইব। যাইবে ত?"

"তোমার যাইতে ইচ্ছা হইয়াছে—যাইও। আমি ত কোন দিন তোমাকে কোন কার্য্য হইতে নিবারিত করি নাই। আমাকে লইয়া যাওয়া কেন?" স্বরে কেমন একটু তীব্রতা ছিল।

সতীন্দ্র যেন আর সহ্য করিতে পারিল না, বলিল, "শৈল, অনেকবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—আজও আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর কেন?"

"আমি কি মন্দ ব্যবহার করিয়াছি?"

"সকল স্ত্রীই স্বামীর সঙ্গে এমনই ব্যবহার করে?"

"আমি ত অনেক দিনই বুঝাইতে চাহিয়াছি—তুমিই বুঝাইতে

দাও নাই। আজ জানিতে পারিবে।"—বলিয়া শৈল শয্যা ত্যাগ করিল, দ্বার মুক্ত করিয়া কক্ষের দক্ষিণের ছাতে গেল।

ছাতে যাইয়া শৈল আকাশের দিকে চাহিল—গ্রহতারাপূর্ণ নীলাম্বরে অসম্পূর্ণগোলক চন্দ্র জ্যোৎস্না ছড়াইতেছে। শৈল কি ভাবিল। সে কি অন্য দিনেরই মত আশা করিতেছিল, সতীন্দ্র এখনই আসিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে? সে কি রমণীসুলভ কৌতূহলবশে আজ আবার সতীন্দ্রের ব্যবহার লক্ষ্য করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল?

বিদ্যুতের স্পর্শে শরীরের শিরাউপশিরায় যেমন সহসা বিষম আঘাত লাগে, তেমনই দারুণ আশঙ্কায় সতীন্দ্রনাথের দুর্ব্বল স্নায়ুতে বিষম আঘাত লাগিল। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। উন্মাদের মত সেও কক্ষের বাহিরে আসিল।

শৈল স্বামীর দিকে চাহিল—জ্যোৎস্নালোকে দেখিল, স্বামীর নয়নে অন্য দিনের মত আশঙ্কা ও অনুনয়ের দৃষ্টি নাই—নয়নদ্বয় যেন জ্বলিতেছে। সে দৃষ্টি দেখিয়া আজ তাহারই হৃদয়ে আশঙ্কার সঞ্চার হইল।

সতীন্দ্রনাথ দ্রুত অপ্রশস্ত ছাত পার হইল; মুহূর্ত্তে ছাতের আলিসাও অতিক্রম করিল।

ভয়ে শৈলবালার চরণদ্বয় কম্পিত হইতেছিল। সে দ্রুত যাইয়া স্বামীকে নিবারিত করিবার চেষ্টা করিল। পারিল না।

সে আলিসায় বুক দিয়া নিম্নে রাজপথে চাহিয়া দেখিল—

সতীন্দ্রনাথের কপাল মস্তকচ্যুত—মস্তিষ্ক চূর্ণ বিচূর্ণ—স্বামীর গতপ্রাণ দেহের কি বিকৃতি! কেবল নয়ন তেমনই জ্বলিতেছে।

শৈলের শরীরে রক্ত যেন শীতল হইয়া গেল—সমস্ত শরীর অবসন্ন—চারি দিক তাহার স্বামিবিরহিত জীবনেরই মত শূন্য—অন্ধকার। সে সেই শূন্য ছাতে বসিয়া পড়িল—মরিতে পারিল না।

দোষ কাহার ?

১

চার বৎসর ইংলণ্ডে কিছু আইন ও মহিলা-সমাজে মিশিবার অনেকটা আদব কায়দা শিক্ষা করিয়া মসৃণ আননে প্রাপ্তবয়স্কের চিহ্ন লইয়া যামিনীমোহন কর যখন দেশে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয় স্বজনগণ ভিন্ন আর কেহই তাহাকে পূর্ব্বপরিচিত যামিনী নামে সম্বোধন করা সঙ্গত মনে করিলেন না। শ্রীমান্ যামিনীমোহন ইঙ্গবঙ্গদলে "মিষ্টার কর" হইয়া দাঁড়াইলেন। আবার শতাধিক ক্ষুদ্র আদব কায়দার বাহাদুরীতে মহিলাসমাজে যামিনী-মোহন শীঘ্রই সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

কোনও মহিলাকে দেখিলে সম্ভ্রমে অভিবাদন করিতে, মহিলাদিগের অনুরোধে অতি সলজ্জভাবে মধুরকণ্ঠে দুই একটি গান গাহিতে ও তাঁহাদিগের একাধিক সহস্র ছোটখাট আবশ্যকে অনাহূত মনো-যোগ দিতে, যামিনীমোহনের সমকক্ষ বড় কেহ ছিল না। অল্প-দিনের মধ্যেই মহিলাদিগের প্রশংসালাভ ও তাঁহাদিগের স্বেচ্ছায় নিক্ষিপ্ত পাখা ও রুমাল কুড়াইবার ভার যামিনীমোহনের প্রায় একচেটিয়া হইয়া উঠিল। মিষ্টার করের প্রখর করে সমাজের

(অর্থাৎ 'সোসাইটী'র) বহু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নিতান্ত ম্লান দেখাইতে লাগিল।

যামিনীমোহনকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য পদার্পিতমাত্র-যৌবনা হইতে বিগতপ্রায়যৌবনা কুমারীসমাজে কিরূপ ব্যগ্রতা লক্ষিত হইয়াছিল, কোনও সান্ধ্য-সমিতি হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে নিষ্ফল প্রয়াসে কত ব্যথিত কোমল হৃদয় হইতে দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইত, এবং নিশীথে কত বেদনাব্যঞ্জক অশ্রু নীরবে কত উপাধান সিক্ত করিত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এরূপ অবস্থায় যে প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার জননীরা যামিনীমোহনকে জামাতৃরূপে পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন, ইহা অবশ্যই স্বাভাবিক।

বস্তুতঃ, যামিনীমোহনের আগমনে ইঙ্গবঙ্গসমাজে বেশ একটু সজীবতা ও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

২

অল্প দিনের মধ্যেই সকলে বুঝিতে পারিল যে, মহিলাসমাজে মিশিয়া যামিনীমোহন হৃদয়টাকে পদ্মপত্রে জলের মত নিতান্ত নির্লিপ্ত রাখিতে পারে নাই। কুমারীদিগের মধ্যে কুমারী বিমলা বসুর প্রতি তাহার কিছু অতিরিক্ত মনোযোগ লক্ষিত হইতে লাগিল। মিস্ বসু পিয়ানোর নিকট যাইলেই যেন কোনও অলক্ষিত আকর্ষণে যামিনী-মোহনও তথায় যাইয়া উপস্থিত হইত, এবং কখন্ তাঁহার পুস্তকের পাতা উল্টাইতে হইবে, তৎপ্রতি এত অধিক মনোযোগ দিত যে, তাহার আর সেই সুধাময় সঙ্গীত উপভোগ করিবার অবসর হইত না। সেই সময়

তাহার চেয়ারের পশ্চাতেই যে ব্যর্থ আশার বেদনা লুকাইয়া সামান্য প্রাণহীন হাসি হাসিয়া কুমারীগণ পরস্পরের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টির বিনিময় করিতেন, তাহা সে দেখিতেও পাইত না। প্রেম মানবকে এমনই অন্ধ করে! প্রেমিক কল্পনা-জগতে বাস করে; সেখানে বাস্তবের কঠোর সত্য তাহার স্বপ্নভঙ্গ করিতে পারে না। ভ্রান্ত প্রেমিক সেই জগতে বাস করিয়া প্রেমিকাকে আপনার জীবনের সার্থক সাধন বলিয়া মনে করে; প্রেমিকা তাহার নিকট তদীয় মানসকল্পিত আদর্শ—তাহার কোথাও কোনও দৈন্য, কোনও অসম্পূর্ণতা নাই।

এখন আর যামিনীমোহন কেবল বিদেশীয় কবিদিগের মধুর প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করিয়াই সন্তুষ্ট হয় না; এখন সে আপনিও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। হৃদয়ের পূর্ণতায় কবিতা আপনি আইসে। আকাঙ্ক্ষার বেদনা থাকিলে অন্তরের অন্তর হইতে গীত-ধ্বনি আপনি ধ্বনিত হইয়া উঠে। হিমাবসানে নব-বসন্ত-সমাগমে যেমন কুসুমসুষমাসম্পন্ন বনভূমিতে কোকিলকাকলি আপনি আত্ম-প্রকাশ করে, তেমনই নবপ্রেমসমাগমে মানব-হৃদয়ে কবিতা আপনা-আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কেহ তাহা প্রকাশ করিতে পারে, কেহ পারে না।

যামিনীমোহনের ও বিমলার যাহাই অভিপ্রায় থাকুক, কর্ম্মহীনা মহিলাগণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া প্রচার করিলেন যে, শীঘ্রই তাহাদের বিবাহ হইবে। আবার সেই বিবাহের যোগ্যতা অযোগ্যতা লইয়া তর্কবিতর্ক, বিচার, আন্দোলন চলিতে লাগিল।

পরচর্চ্চার কি একটা আকর্ষণ আছে, জানি না ; কিন্তু সসঙ্কোচে এ কথা বলিতে হয় যে, কেবল মহিলাসমাজে নহে—পুরুষসমাজেও পর-চর্চ্চা-প্রিয়তা প্রায় সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এইরূপে কয় মাস কাটিয়া গেল।

৩

কয় মাস পরেই সহসা একটা বড় পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল। যেমন শরতের আকাশে সহসা খানকতক মেঘ আসিয়া প্রকৃতির হাস্যোজ্জ্বল আনন মলিন করিয়া দেয়—তাহারা কোথা হইতে আইসে, কেন আইসে, কোথায় উৎপন্ন হয়, কেহ তাহা বলিতে পারে না, তেমনই সহসা এই প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যেন পূর্ব্বতন আকর্ষণের স্থলে উপেক্ষার ভাব আসিল ;—কেন যে এ ভাব আসিল, কোথা হইতে যে এ ভাব আসিল, তাহা বাহিরের লোক কেহ জানিতে পারিল না বলিয়াই সে রহস্যের উদ্‌ঘাটন-চেষ্টা যেন অতি প্রবল হইয়া উঠিল। যাহা অজ্ঞাত, তাহাই জানিবার জন্য ঔৎসুক্য বুঝি সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই মানব-চরিত্রের একটা বিষম দুর্ব্বলতা ; তাই জন্ম মৃত্যুর রহস্য-উদ্‌ঘাটনের বৃথা চেষ্টায়, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-তত্ত্বের মূলে কোনও বুদ্ধিসম্পন্ন মহাশক্তির অস্তিত্ব-বিচারে, মানবের মানসিক পরিবর্ত্তনের ইতিহাসে বহু পৃষ্ঠা পূর্ণ।

কেন যে এ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল, তাহার কারণ বাহিরের কেহ জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু যখন একটা সমিতিতে দৃষ্ট হইল যে, মিস বসুর সহিত যামিনীমোহনের সাক্ষাৎ হইলে কেবল

পরিচয়জ্ঞাপক সামান্য অভিবাদনমাত্র বিনিময়ের পর দুই জনে দুই দিকে চলিয়া গেল ও তাহার পর আর তাহারা দেখা করিল না, তখন সকলেই স্থির করিলেন যে, একটা কিছু বিশেষ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে—বিনা মেঘে কি কখনও বজ্রাঘাত হইতে পারে?

কথায় বলে,—"যার বিয়ে তার মনে নাই; পাড়াপড়শীর ঘুম নাই।" এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ব্যাপার দাঁড়াইল। যখন বিমলার সহিত যামিনীমোহনের বিবাহের কথা প্রচারিত হইয়াছিল, তখনও তাহাদের দুই জনের অপেক্ষা মহিলাসমাজের ভাবনাটাই অধিক হইয়াছিল; এখনও যেন তাহাদিগের অপেক্ষা সেই কর্ম্মাভাবক্লান্ত মহিলাসমাজেরই ভাবনাটা অধিক হইল। কোথাও দুই চারি জন মহিলা একত্র হইলেই কেবল সেই এক কথা। গৃহের এক পার্শ্বে কোনও প্রৌঢ়া চার পাঁচ জন শ্রোতার নিকট অতি মৃদুস্বরে বলিতেছেন যে, নিশ্চয়ই ইংলণ্ডপ্রবাসকালে যামিনীমোহন কোনও মহিলার সহিত বিবাহের প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছিল; আর এক পার্শ্বে এক জন কৌতুকপরায়ণা যুবতী সেই কথা লইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন যে, যাহাই হউক, সহজে যে বিমলার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে অমন শিকার ছাড়ে, ইহা বিশ্বাস হয় না—নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু গলদ আছে; কেহ বলিতে লাগিলেন, যামিনীমোহনের দোষেই বিবাহসম্বন্ধ ভঙ্গ হইয়াছে; কেহ বলিতে লাগিলেন,—বিমলার দোষেই বিবাহসম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আসল ব্যাপার যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, ক্রমে মহিলাসমাজে এই অন্দোলন এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাহার মধ্যে অবস্থান করা বিমলার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিল। শিলাপাততাড়িতা ভয়চকিতা হরিণী যেমন প্রান্তর-প্রান্তে ভগ্ন জীর্ণ দেবালয়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, বিমলা তেমনই বহুদূরে—বোম্বাই সহরে এক খুল্লতাতের নিকট চলিয়া গেল। কলিকাতার মহিলাসমাজে দিন কতক অনেকে তাহার পরিচিত মধুর কণ্ঠ, সরস মধুর সুরুচিসম্পন্ন কথাবার্ত্তা ও পরিচিত পীতবর্ণের পোষাকের অভাব অনুভব করিলেন। অবশ্য এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, কেহ কেহ তাহার কলিকাতা-ত্যাগে আনন্দিত হইল ;—কারণ 'সোসাইটী'তে সর্ব্ব বিষয়ে তাহার মত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বড় সচরাচর দেখা যায় না। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে সকলে সে অভাব ভুলিয়া গেল ;—অপেক্ষাকৃত ক্ষীণজ্যোতিঃ জ্যোতিষ্কগণই সকলের নয়নানন্দ হইয়া উঠিল।

৪

বিমলা কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার কয় দিন পরে যামিনী-মোহনও সমাজে মেশামিশি ছাড়িয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত,—"সব লোকের দৃষ্টির বাণ আর সহিতে পারি না।—'সোসা-ইটী'র পক্ষে আমি মৃত।" বন্ধুরা হাসিয়া বলিতেন, "মনে রাখিও, মরা হাতী লাখ টাকা।"

যামিনীমোহন কি করিত, কিরূপে সময় কাটাইত, ইত্যাদি—তাহার দুই চারি জন বন্ধু ব্যতীত বাহিরের কেহ বড় জানিতে পারিত

না। পরনিন্দা-পরায়ণ মহিলাগণ সে কথা লইয়া দিন কতক আপন আপন মতামত ব্যক্ত করিলেন; তাহার পর নূতন কথায় নূতন কুৎসায় সকলে সে আলোচনা ত্যাগ করিলেন।

যামিনীমোহনের বন্ধুগণ তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, সকল মানবের জীবনেই নানা অপ্রীতিকর ঘটনার ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যায়; জীবনের একটা সামান্য ঘটনা লইয়া একেবারে গৃহ-কোণবাসী হইয়া সকল কার্য্যে অবহেলা করা উচিত নহে;—তিলকে তাল করাটা সুবুদ্ধির কাজ নহে। বন্ধুদিগের এইরূপ কথায় যামিনী-মোহন কোনও উত্তর দিত না,—কেবল একটু হাসিত। কাহারও কাহারও হাসিবার বিশেষ একপ্রকার কৌশল থাকে; যে কোনও বিষয়ই হউক, তাহারা একটু হাসিয়াই সব শেষ করিতে পারে। যামিনীমোহনেরও সেইরূপ হাসিবার কৌশল ছিল। বন্ধুদিগের এত যে গুরুগম্ভীর উপদেশ, যামিনীমোহন কেবল একটু হাসিয়াই সে সব উড়াইয়া দিত; কোনও উত্তরই দিত না। বলিয়া বলিয়া বন্ধুদিগের উৎসাহও ক্রমে কমিয়া যাইতে লাগিল।

যামিনীমোহনের কায ছিল কেবল—দুই তিনখানা দৈনিক সংবাদ-পত্রের আদ্যোপান্ত ও রাশি রাশি নূতন উপন্যাস পাঠ করা। যামিনীমোহনের বন্ধুরা আশা করিতেন যে, এই একঘেয়ে জীবন শীঘ্রই তাহার বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়াইবে; তখন সে আবার সক-লের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিবে, আবার ব্যবসায়ে মনোযোগ দিবে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে যামিনীমোহনের কোনও পরি-

বর্ত্তনের সম্ভাবনা দৃষ্ট হইল না। সে কিছুতেই আপনার নিভৃত গৃহকোণ পরিত্যাগ করিল না।

৫

কলিকাতার মহিলা-সমাজ হইতে দূরে তালীবনশ্যাম সমুদ্রকূলে বিমলা কেমন করিয়া দিন কাটাইত, তাহার সংবাদও সর্ব্বদা কলিকাতায় আসিত না। মধ্যে মধ্যে সে তাহার পরিচিতদিগকে দুই একখানা পত্র লিখিত। কোনও পত্রে মৃদুসমীরসঞ্চারে ক্ষুদ্রক্ষুদ্রবীচিবহুল বারিধিবক্ষে তরী ভাসাইয়া হস্তি-গুহায় গমনের কথা,—প্রত্যাবর্ত্তনকালে অস্তগামী তপনের মরণাহত করজালে লোহিতাভ গগনপটে অঙ্কিতবৎ বোম্বাই সহরের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা থাকিত; কোনও পত্রে এক দিন মধুর সন্ধ্যাকালে কোনও মধুরহাসিনী পার্শী যুবতীর পরিণয়ের বর্ণনা থাকিত; কোনও পত্রে বর্ণবৈচিত্র্যবহুলবেশপরিহিতা সুন্দরীকুলে পরিপূর্ণ সাগরানিলসেবিত সিন্ধুকূলে ভ্রমণের বর্ণনা থাকিত। কিন্তু সে সকল পত্রে পরিচিত কলিকাতা 'সোসাইটী'তে ফিরিবার জন্য আকুলতা ও সে 'সোসাইটী' পরিত্যাগ করাতে কোনও প্রকার দুঃখ প্রকাশ পাইত না।

সেই সকল পত্র লইয়া কলিকাতার মহিলা-সমাজে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু আন্দোলন হইত। মহিলারা আশা করিতেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই বিমলা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে। তাঁহারা বলিতেন যে, বিমলা নিতান্তই 'সেন্টিমেণ্ট'-প্রবণা বালিকা; নহিলে একটা সামান্য ঘটনা লইয়া সে অতটা করিত না;—এমন

প্রেম-পরিচয়, এমন বিবাহ-সম্বন্ধ, এমন বিবাহ-সম্বন্ধ-ভঙ্গ, এ ত নিত্যই হইয়া থাকে; ইহা লইয়া এতটা কল্পা কোনও বুদ্ধিমতী রমণীরই উচিত নহে।

যিনি যে মতামত ব্যক্ত করুন,—তাহাতে কাহারও কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল;—বিমলা ফিরিয়া আসিল না; তাহার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের কোনও সূচনাও লক্ষিত হইল না। উদ্যানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কুসুমটি ঝরিয়া গেলে যে সমগ্র উদ্যান নষ্ট হয়, তাহা নহে; একা বিমলা ছিল না বলিয়া যে মহিলা-সমাজে সমিতি, নিমন্ত্রণ, কুৎসা ও পরচর্চ্চার অভাব ছিল, তাহা নহে।

৬

বিমলা বোম্বাই যাইবার পর প্রায় ছয় মাস চলিয়া গিয়াছে।

যামিনীমোহনের গৃহে কয় জন বন্ধু আহার করিতে বসিয়াছেন।

সুসজ্জিত টেব্‌ল হইতে প্রস্ফুটিত কুসুমের মৃদু সৌরভ, আহারীয়ের গন্ধ ও কাঁটা চামচের ঠুন্‌ঠুন শব্দ উঠিতেছে। সরস কথা-বার্ত্তায়, তদপেক্ষাও সরস আহারীয়ে, 'পার্টী' বেশ জমিয়াছে। মধ্যে মধ্যে উচ্চ হাস্য উঠিতেছে। কতকগুলি যুবক একত্রিত হইয়া আহারে বসিলে যাহা হয়, তাহার কিছুরই অভাব নাই।

এক জন বলিল, "তবে যামিনীমোহন, তুমি এখন সেই প্রেম-ব্যাপারের স্মৃতিটা বেশ ভুলিতে পারিয়াছ!"

কাঁটা ও ছুরী রাখিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া যামিনীমোহন হাসিতে

হাসিতে বলিল, "প্রথম বয়সের সে পাগলামীর কথা আর বলিও না। তবে এইবার আমি তিনটী জিনিস বেশ বুঝিয়াছি।"

কয় জনে সমস্বরে বলিল, "কি ?"

যামিনীমোহন বলিল, "জগতে তিনটি কাজ স্ত্রীলোক কখনও করিতে পারে না ;—রাত্রিকালে খাটের নিম্নে চাহিয়া দেখিতে পারে না ; স্ত্রীলোক কখনও কোনও কথা গোপন রাখিতে পারে না ; স্ত্রীলোক কখনও ভালবাসিতে পারে না।"

সকলে হাসিয়া উঠিল।

এক জন বলিল, "তবুও ভাল যে, তুমি এ ধাক্কা কাটাইয়া উঠিয়াছ। আবার শীঘ্র ফাঁদে না পড়িলে হয় !"

যামিনীমোহন বলিল, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পার ; এ নয়ন আর কখনও রমণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবে না।"

এক জন বলিল, "সেটা বড় ভরসার কথা নহে ; জান ত—

'আঁখিতে চাহে না প্রেম, মন দিয়া চায়,
দৃষ্টি-হীন স্মর তাই বিদিত ধরায়।'

মনটা সাবধানে রাখিও।"

আর একবার গৃহমধ্যে উচ্চহাস্য-ধ্বনি ধ্বনিত হইল।

এক জন বলিল,—"সে কি কথা !—আমি ত বুঝি, আঁখি মেলিয়া যাহাকে ভাল লাগে, তাহাকেই ভাল বলিয়া জানি। যাহা হউক যামিনীমোহন, এবার য়ুরোপ ঘুরিয়া আসিয়া ভাল করিয়া কাযে মন দাও। ইংলণ্ডের কথা ভাবিলে আর এই ঘাম ও

ঘামাচির দেশে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। ইংলণ্ডের কাছে ভারতবর্ষ !"

আর এক জন বলিল, "তুমি কি দেশদ্রোহী না কি? ভারতবর্ষে কি নাই বল ত? আর ভাল হউক মন্দ হউক, এই আমাদের দেশ। আমরা যদি কাক হই—কাক থাকাই আমাদের ভাল,—ময়ূরপচ্ছ চুরি করিয়া ময়ূরের দলে মিশিবার দুরাকাঙ্ক্ষা না করাই কি ভাল নহে?"

পূর্ব্ব বক্তা বলিল, "যাহা বলিতে হয় বল, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডই আমার বেশী ভাল লাগে।"

যামিনীমোহন বলিল, "আমাকে একবার ঘুরিয়া আসিতে দাও; তাহার পর দেখিবে, সুপ্ত সিংহ আবার জাগিয়াছে;—দেখিবে, রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে সমাজ-সংস্কার পর্য্যন্ত সবই এক জনে কেমন করিয়া করে। আমি জুতা শেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সবই করিব।"

আবার একবার হাস্য-ধ্বনি উঠিল।

আহারান্তে কিঞ্চিৎ মদ্যপানানন্তর সকলে পার্শ্বের একটা ঘরে উঠিয়া গেলেন। সেখানে চুরুট-টানা ও গল্প গুজব চলিতে লাগিল।

এক জন বলিল, "দেখ যামিনীমোহন, তুমি বোম্বাই না যাইয়া এখান হইতেই জাহাজে রওনা হও। বোম্বাই গেলে তুমি একবার বিমলার খুড়া মহাশয়ের নিমন্ত্রণ এড়াইতে পারিবে না। সেখানে তোমার সহিত বিমলার সাক্ষাৎ হইবে। আপনার উপর বড় অধিক বিশ্বাস-স্থাপন করাটা যুক্তিসঙ্গত নহে।"

যামিনীমোহন বলিল, "সে ভয় আর করিও না। আমার অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে—আর কোনও আশঙ্কা নাই।"

ইহার পর কিছুক্ষণ গল্পগুজবান্তে স্ব স্ব টুপী ও যষ্টি লইয়া একে একে নিমন্ত্রিতগণ স্বস্বগৃহাভিমুখগামী হইলেন।

যামিনীমোহন মনঃস্থ করিয়াছে,—আর একবার য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিবে, য়ুরোপ ঘুরিয়া আপনার প্রেমস্মৃতির শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া সে আবার নূতন হইয়া দেশে ফিরিবে। দুই দিন পরে যামিনীমোহন রওনা হইবে—আয়োজন সব ঠিক ঠাক হইয়া গিয়াছে।

৭

প্রভাত-পবনে শেষ ফাল্গুনের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণাঙ্গী জাহ্নবীর বক্ষে ক্ষুদ্র তরঙ্গ খেলা করিতেছে। উপরে অনন্তপ্রসারিত নীলাম্বর; দক্ষিণে হাবড়ার পুল;—আজ পুল খোলা; বামে নদীবক্ষে বহু-সংখ্যক বাষ্পীয় জলযান, পান্‌সী ও ভাউলে; উভয় তীরেই স্নানের ঘাটে নরনারীগণ স্নান করিতেছেন। একখানা মধ্যায়তন পানসী কলিকাতার পার হইতে হাবড়ার পারে লাগিল। পান্‌সী হইতে কয় জন নিরবচ্ছিন্ন-ইংরাজবেশধারী ও কয় জন নিরবচ্ছিন্ন-বাঙ্গালী-বেশধারী যুবক অবতরণ করিলেন। বহু কষ্টে তটভূমির কর্দ্দম হইতে পাদুকার নবসংস্কৃত শ্রী রক্ষা করিয়া তাঁহারা উপরের রাস্তায় উঠিলেন। তাঁহারা হাবড়া ষ্টেশনে চলিলেন; পশ্চাতে পশ্চাতে দুই জন কুলি দ্রব্যাদি লইয়া চলিল।

ট্রেণ প্ল্যাটফরমে উপস্থিত ছিল। এঞ্জিন্ হইতে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ উঠিতেছিল; যেন কর্ম্মপ্রার্থী দানব অধীরতা প্রকাশ করিতেছিল; প্ল্যাটফরমে লোক জনের গতায়াত, হাঁকাহাঁকির গোল উঠিতেছিল। যামিনীমোহনের বন্ধুগণ একটা খালি কামরায় তাহার দ্রব্যাদি তুলিয়া দিলেন। এক জন ছুটিয়া যাইয়া একখানা সংবাদ-পত্র কিনিয়া আনিলেন, এমন সময় প্রথম ঘণ্টা পড়িল। যামিনী-মোহন কামরায় উঠিয়া বসিল। ডাকাডাকি দৌড়াদৌড়ি আরও প্রবল হইয়া উঠিল; 'পান-চুরুট-দেশলাই'ওয়ালাগণ আরও উচ্চস্বরে বিক্রেয় জিনিস হাঁকিতে লাগিল।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল। যামিনীমোহন বন্ধুগণের সহিত করমর্দ্দন করিল। এক জন হাসিয়া বলিলেন, "দেখিও, যেন কোনও নীল-নয়নার কনক-কেশ-জালে জড়িত হইয়া পড়িও না।"

এঞ্জিন্ হইতে একটা তীব্র 'হুইস্‌ল' ধ্বনিত হইল—যেন দানব একবার আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিল। বিজাতীয় কণ্ঠে এক জন শ্বেতাঙ্গ হাকিল, "হঠো! হঠো!" ট্রেণ ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরম হইতে বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, যামিনীমোহনের বন্ধুরা রুমাল উড়াইতে লাগিলেন; ট্রেণ দৃষ্টির বাহিরে যাইলে তাঁহারা ফিরিলেন।

ঘাটে পান্‌সী আরোহীদিগের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিল। যামিনীমোহনের বন্ধুগণ আসিয়া পানসীতে উঠিলেন,—পান্‌সী আবার কলিকাতার দিকে চলিল।

আরোহীদিগের মধ্যে কয় জন চুরুট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। বন্ধুকে বিদায় দিয়া সকলেই যেন মনের মধ্যে কেমন শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন। এক জন সঙ্গীদিগকে হাবড়ার পুলের নির্ম্মাণ-কৌশল বুঝাইতে লাগিলেন; অন্য সকলে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। জাহ্নবীর জলরাশি যেমন কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, তেমনই শ্রোতাদিগের মনোযোগ বা অমনোযোগের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া তিনি অনর্গল হাবড়ার পুলের নির্ম্মাণকৌশল বুঝাইতে বুঝাইতে চলিলেন।

হাবড়ার পুলের নির্ম্মাণকৌশল বুঝান শেষ হইবার পূর্ব্বেই পান্‌সী আসিয়া তীরে লাগিল; নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বক্তা বক্তৃতা বন্ধ করিলেন। সকলে অবতরণ করিলেন।

৮

ট্রেণ হাবড়ার প্ল্যাটফরম্ ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। প্রকৃতির শোভাময় সৌন্দর্য্যের মধ্যে আসিয়া যামিনীমোহনের নগরদৃশ্যক্লান্ত নয়ন বড় আনন্দ লাভ করিল। যে দিকে তাকাও, কেবল সবুজের খেলা;—মাঝে মাঝে কোথাও একটা ডোবায় বা নালায় এখনও কিছু জল আছে, তাহার প্রায় সর্ব্বাংশই পানায় সমাচ্ছন্ন।

কিন্তু যামিনীমোহনের নয়ন আনন্দ বোধ করিলেও তাহার হৃদয় সে আনন্দোপভোগে অংশী হইতে পারিল না। পশ্চাতে পরিচিত, সম্মুখে অজ্ঞাত;—পশ্চাতে পরিচিত গৃহকোণ, সম্মুখে লক্ষ্যহীন ভ্রমণ;

—পশ্চাতে অভ্যস্ত জীবন, সম্মুখে অনভ্যস্ত নূতন ব্যাপার; পশ্চাতে প্রাচীন, সম্মুখে নবীন! যেন কোন হতভাগ্য গৃহে জীবনের সুখ-দুঃখে বহুদিনের সঙ্গিনীকে রাখিয়া কোন অপরিচিত দারান্তর গ্রহণ করিতে যাইতেছিল। এই সময় স্বভাবতঃই অতীত জীবনের পরিচিত ঘটনা সকল ও শত শত ছোট খাট সুখ-দুঃখের স্মৃতি মনে পড়ে,—তাহাদিগের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই পুরাতন ও নূতনের সন্ধিস্থলে আজ অতীত জীবনের শত স্মৃতি যামিনীমোহনের হৃদয় প্লাবিত করিয়া তুলিল। তাহার হৃদয়ে স্মৃতির পর স্মৃতি, চিত্রের পর চিত্রের মত উদিত হইতে লাগিল—তাহার অধিকাংশই অস্পষ্ট। অতীত জীবনের সেই শত স্মৃতির মধ্যে একটা ঘটনার স্মৃতি, এক জনের স্মৃতি, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল।

দিন যায়, রাত্রি আইসে; আবার দিন যায়; ট্রেণ গন্তব্যস্থানাভিমুখে ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

জীবনের সর্ব্বপ্রধান সুখ ও সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র যাতনার স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলা অসম্ভব। তাই আজ সেই অতীত প্রেমের স্মৃতি তাহার হৃদয়ে যেন আরও স্পষ্ট হইয়া ফুটিতে লাগিল;—বিমলার কথা কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

এই সময় ট্রেণ একটা বড় ষ্টেশনে আসিয়া স্থির হইল। যাত্রীদিগের উঠা নামা, গোলমাল আরম্ভ হইল। বোম্বাই হইতে কলিকাতাগামী ট্রেণও তখন সেই ষ্টেশনের অপর প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া

ছিল। যামিনীমোহন চাহিয়া দেখিল, সেই ট্রেণে—বিমলা। যামিনী-মোহন আপনার কামরার সেই দিকের দ্বার খুলিয়া নামিতে গেল—দ্বার রুদ্ধ। বিফলমনোরথ হইয়া, সব ভুলিয়া যামিনীমোহন উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"বিমলা!"

সেই পরিচিত নয়নে বিস্ময় ও বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি; তাহার পর গবাক্ষে দুইখানি পরিচিত হস্ত দৃষ্ট হইল; গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

যামিনীমোহন আর একবার তীব্র বেদনাব্যঞ্জক স্বরে ডাকিল—"বিমলা!"

সেই সময় কলিকাতাভিমুখগামী ট্রেণের এঞ্জিন হইতে তীব্র 'হুইসল্' শ্রুত হইল; ট্রেণ প্ল্যাটফরম্ ছাড়াইয়া গেল। যামিনীমোহন চেতনাহতের মত নিকটস্থ আসনে বসিয়া পড়িল। যখন সে প্রকৃতিস্থ হইল, তখন দেখিল, ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে। তীব্রতম যাতনায় তাহার হৃদয় মথিত হইতেছিল।

ট্রেণ যখন বোম্বাই সহরে পৌঁছিল, তখন যামিনীমোহনের জীবনের আর কোনও লক্ষ্য নাই।

* * * *

ইহার পর যামিনীমোহন বোম্বাইয়ের পদতলচুম্বী নীল সাগরসলিলে আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, কি য়ুরোপীয় সমাজের সদাচঞ্চল ফেনিল উত্তেজনাময় স্রোতে জীবন ভাসাইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে কাহার দোষে বিমলা ও যামিনী-

মোহনের বিবাহসম্বন্ধ ভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা লইয়া কলিকাতার মহিলাসমাজে আজও তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। কিন্তু কে বলিবে,—দোষ কাহার?

নর্ত্তকী।

—:০:—

১

ময়েজদ্দীন দারোগা বাঙ্গালা হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। যেমন সময় সময় লঘু তৃণখণ্ড ঝটিকায় নদীস্রোতে নিপতিত হইয়া ক্রমে সাগরে উপনীত হয়, তেমনই ময়েজদ্দীন ঘটনাস্রোতে বাঙ্গালার পল্লী-প্রান্তর হইতে রাজনীতির তরঙ্গভঙ্গভীষণ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিল। হুগলীর নিকটবর্ত্তী গণ্ডগ্রামনিবাসী কৃষক তমেজ মণ্ডলের পুত্র ময়েজ যে ঘটনায়—যেরূপে দিল্লীতে উপনীত হইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র গল্পের অবতারণা করিতে হয়। সে বিবরণ উপন্যাসের মত বিস্ময়কর। ময়েজ যখন অনাহারক্লেশতাড়নায় গ্রাম ত্যাগ করিয়া হুগলীতে আইসে, তখন তমেজের আপনার এক বিঘা ভূমিও নাই; সে এক জন প্রতিবাসীর কয় বিঘা জমী 'ভাগে' করিয়া কোনরূপে দিনাতিপাত করে। এখন সে গ্রামের মহাজন। তাহার গৃহে অনেকগুলি ঘর; ময়েজ ইট পোড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছিল, তমেজ তাহাতে কাণ দেয় নাই। এখন তাহার "জরু, গরু, ধান—তিন বিদ্যমান" ত বটেই, পরন্তু তিনেরই অনাবশ্যক বাহুল্য। গুটীপোকা যেমন প্রজাপতিতে পরিণত হয়, ময়েজদ্দীন তেমনই বাঙ্গালার মুসলমানের হিন্দু বেশ-

ভূষা ত্যাগ করিয়া দিল্লীর মুসলমানের ধরণ ধারণ অবলম্বন করিয়াছে। সে পায়জামা ও চাপকান পরিধান করে, পাগড়ী বাঁধে, নাগরা পায় দেয়, উর্দ্দু কহে। ময়েজ মণ্ডল এখন ময়েজউদ্দীন খাঁ। ময়েজদ্দীন দিল্লীতে বিবাহ করিয়াছে; অবস্থাবিপাকে দীনদশাগ্রস্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার ময়েজ-অবস্থার বিবাহিতা —রৌপ্যালঙ্কারে সন্তুষ্টা পত্নী ও তাহার গর্ভজাত সন্তানগণ দেশেই থাকে। দুই বৎসর পরে ময়েজদ্দীন ছুটীতে দেশে আসিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দারোগা সব-ইন্‌স্পেক্টর বা ইন্‌স্পেক্টর মাত্র নহে। তখনও ভারতবর্ষ বিদেশীয় শাসন-যন্ত্রের পেষণে স্বাতন্ত্র্য-রস-সম্পর্কশূন্য হইয়া পড়ে নাই। তখন সিপাহী যুদ্ধের ঝটিকাঘাতে নির্ব্বাপিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মোগলের নিঃশেষিতপ্রায়তৈল গৌরবদীপ মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে। তখন বাহাদুর শাহ পশ্চিম চক্রবালে হৃতরশ্মি দিনান্ত-তপনের মত দিল্লীর প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন। দিল্লীর প্রাসাদ-শুদ্ধান্তে—জিনাত মহল মোগলের বিগত গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখিতেছেন, এবং স্বামীর ঔদাস্যে ও অবস্থার প্রতিকূলে সংগ্রাম বিষয়ে নিশ্চেষ্টতায় মর্ম্মাহত হইতেছেন; তাঁহার কূটবুদ্ধি নানাবিধ ষড়যন্ত্রের উদ্ভাবনে সচেষ্ট।

তখনও চারি দিকে রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই। কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল পাতা হইতেছে মাত্র। দুই দিকের গ্রামের অধিবাসীরা তাহা দেখিতেছে, দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে,—দুইখানা রেলের উপর দিয়া অশ্ব, উষ্ট্র, গো, বা হস্তী শূন্য যান কিরূপে যাইবে,

তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বাদশাহ-বিজয়ী শের শাহের অসাধারণ কীর্ত্তি বৃক্ষছায়াস্তৃত, সুগঠিত পথ তখনও সুরক্ষিত, এবং যাতায়াতের প্রধান উপায়। পথে মধ্যে মধ্যে চটি বা সরাই। পথিক সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যা হইলে সরাইয়ে আশ্রয় লয়। পথে দস্যু তস্করের ভয়; রাত্রিতে সঙ্গিহীন অবস্থায় পথ চলা বিপজ্জনক; কতকগুলি যান একত্র হইলে সময় সময় চলে মাত্র। লোকে সশস্ত্র হইয়া বাহির হয়—বিদেশী শাসকের অস্ত্র-আইনে দেশ তখনও আত্ম-রক্ষায় অক্ষম হইয়া পড়ে নাই। প্রায় সকল সরাইয়ে যান পাওয়া যায়; সাধারণ পথিক যান পরিবর্ত্তন করিয়া গমন করে—ধনীদের ব্যবস্থা অন্যরূপ। ময়েজদ্দীন সরাইয়ে সরাইয়ে যান পরিবর্ত্তন করিয়া চলিতেছিল। কোনও সরাইয়ে যানের অভাব হয় নাই। দিল্লী আর দুই দিনের পথ। সন্ধ্যায় ময়েজদ্দীন একটি সরাইয়ে পঁহুছিল।

২

সে সরাইয়ে কয়েকখানি যান ছিল। ভাড়া করিবার চেষ্টার ফলে ময়েজদ্দীন জানিল, সবগুলি ভাড়া হইয়া গিয়াছে; এক জন নর্ত্তকী ভাড়া করিয়াছে। ময়েজদ্দীন অধিক ভাড়া দিতে স্বীকৃত হইল। এক যান-চালক প্রলোভনে পড়িয়া নর্ত্তকীর কর্ম্মচারীদিগকে বলিতে গেল, সে অধিক ভাড়া পাইতেছে, সেই ভাড়ায় যাইবে। সে ফিরিয়া আসিয়া ময়েজদ্দীনকে বলিল, "নর্ত্তকীর কর্ম্মচারীরা অধিক ভাড়া দিতেই স্বীকৃত।" ময়েজদ্দীন আরও অধিক হাঁকিল; নর্ত্তকীর কর্ম্ম-

চারীরা তাহাতেই স্বীকৃত হইল। কিছু ক্ষণ এইরূপে গেল। তাহার পর ময়েজদ্দীন শুনিতে পাইল, পার্শ্ববর্ত্তী যে গৃহে নর্ত্তকী সদলে অবস্থান করিতেছিল, সেই গৃহ হইতে রমণী-কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "হামিদা! বর্ব্বরের সঙ্গে কতক্ষণ দর হাঁকিবে? যানচালককে বলিয়া দাও, সে অন্যের নিকট যে ভাড়া পাইবে, আমরা তাহাই দিব; আর, প্রত্যেক চালককে এক এক আসরফি পুরস্কার দিব।" স্বর বিরক্তিপূর্ণ।

ময়েজদ্দীন বুঝিল, আর চেষ্টা করা বৃথা। প্রভাতে যাহা হয় করিতে হইবে ভাবিয়া সে আহারাদির আয়োজন করিতে গেল। রাত্রিতে সে কোনও রূপে একখানি যান-প্রাপ্তির উপায়-উদ্ভাবন চিন্তা করিতে লাগিল।

যাহারা আপন চেষ্টায় দুরবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিতে পারে, তাহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ময়েজদ্দীন চতুর লোক; তাহার পর কার্য্যোপলক্ষে নানা লোকের সহিত মিশিয়া, বিশেষ দস্যুতস্করাদি দুষ্কৃতকারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া করিয়া সে নরচরিত্র-জ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়া ময়েজদ্দীন অন্য উপায় অবলম্বন করিল। যাত্রার জন্য যানগুলি প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া সে নর্ত্তকীর এক জন কর্ম্মচারীকে বলিল, "আমি বড় বিপন্ন। ছুটীতে দেশে গিয়াছিলাম; দিল্লীতে পঁহুছিতে বিলম্ব ঘটিলে চাকরী যাইবে। তোমার মনিব যদি একখানি যান ছাড়িয়া দেন, আমার বিশেষ উপকার হয়।"

ভৃত্য যাইয়া নর্ত্তকীকে সংবাদ দিল। নর্ত্তকীর পরিচারিকা হামিদা আসিয়া ময়েজদ্দীনকে বলিল, "তুমি ত অনেক ভাড়া দিতে চাহিতেছিলে ; গাড়ী পাও নাই ?"

পরিচারিকার বেশ দেখিয়া চতুর ময়েজদ্দীন নর্ত্তকীর সম্পদের অনুমান করিতে পারিল ; বলিল, "আমার অপরাধ হইয়াছে। আমি নিতান্ত বিপন্ন, তাই ব্যস্ত হইয়া সে কার্য্য করিয়াছি।"

হামিদা বিদ্রূপের হাসি হাসিল,—তাহার পর বলিল, "গাড়ী আমরা ছাড়িতে পারি না। তবে—তুমি যখন বিপদ জানাইতেছ, তখন এই করিতে পারি যে, একখানি গাড়ীর কতক মাল অন্যান্য গাড়ীতে ভাগ করিয়া দিয়া তোমার বসিয়া যাইবার স্থান করিয়া দিতে পারি। তোমার সঙ্গে অধিক দ্রব্যাদি থাকিলে উপায় নাই।"

ময়েজদ্দীন মুহূর্ত্ত ভাবিল। তাহার বৃদ্ধা মাতা ও পত্নী কর্তৃক তাহার ও তাহার দিল্লীস্থ সন্তানদের জন্য প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্যাদি ময়েজদ্দীন দারোগার বা তাহার সন্তানদের উপযুক্ত নহে,—সে সব হুগলীর নিকটবর্ত্তী গণ্ডগ্রামের অধিবাসী তমেজ মণ্ডলের পুত্র ও পৌত্রাদিরই উপযুক্ত। সে বলিল, "তাহা হইলেই আমার হইবে। সেই দয়াই যথেষ্ট।"

হামিদা ভৃত্যদিগকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিল।

জননীর ও পত্নীর সযত্নরচিত ও সংগৃহীত দ্রব্যাদি ফেলিয়া রাখিয়া ময়েজদ্দীন দারোগা একখানি যানের এক পার্শ্বে স্থান পাইয়া দিল্লীর দিকে চলিল।

ময়েজদ্দীন জানিল, নর্ত্তকী—হাফজান।

দিল্লীতে হাফজানের নাম কে না শুনিয়াছে? ময়েজদ্দীন ভাবিতে লাগিল,—হাফজানের বাঙ্গালায় যাইবার কারণ কি? যান চলিতে লাগিল।

৩

মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে যে স্থানে যান থামিল, সে স্থানে কতকগুলি প্রাচীন বৃক্ষ অবারিত ছায়া বিস্তার করিয়া শ্রান্ত পথিককে বিশ্রাম দান করিতেছিল। পথিপার্শ্বে স্বচ্ছসলিল সরোবর-কূলে একখানি ক্ষুদ্র দোকানঘর; তথায় পথিকদিগের আহারাদির জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। তখন রাজপুরুষের পৃষ্ঠপোষিত অনুষ্ঠানে ভারতবাসী ধনীর অর্থ ব্যয়িত হইত না। তাহা প্রকৃত সদনুষ্ঠানে, লোকের হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত। তখন কঠোর পূর্ত্তকর ছিল না; কিন্তু তখন যে সকল রাজপথ নির্ম্মিত ও সরোবর খনিত হইয়াছিল, সে সকলের তুলনায় এখনকার তদনুরূপ অনুষ্ঠান সমুদ্রের নিকট গোষ্পদ।

হাফজানের অনুচরগণ কানাত দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার মধ্যে তাহাদের আহারের আয়োজন চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে স্থানটি নির্জ্জন দেখিয়া হাফজান কানাতের বাহিরে আসিয়া একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। প্রসারিত প্রান্তর; মধ্যে মধ্যে শস্য-ক্ষেত্র, স্থানে স্থানে বৃক্ষ। হাফজান আর একটু অগ্রসর হইল; মুগ্ধনেত্রে স্বভাবের শোভা দেখিতে দেখিতে

সরোবরকূলে আসিল। যে স্থানে একটি বৃক্ষমূলে দোকানদারের সহায়তায় ময়েজদ্দীন রন্ধনের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিল, ঘটনাক্রমে হাফজান সেই স্থানে আসিল। ময়েজদ্দীন উঠিয়া দাঁড়াইল; সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমি বিপন্ন হইয়া গত রাত্রিতে একখানি যান পাইবার চেষ্টায় বড় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। অপরাধ লইবেন না।"

হাফজান বলিল, "সামান্য কথা; সে কথা কি আর কেহ মনে করিয়া রাখে?"

ময়েজদ্দীন যানে স্থানদানহেতু হাফজানকে প্রচুর ধন্যবাদ দিল।

হাফজান দিল্লীতে তাহার কার্য্য-পরিচয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাঙ্গালায় যাইবার কারণ কি?"

ময়েজদ্দীন বলিল, "আমার আত্মীয়গণ বাঙ্গালায়—" বঙ্গদেশে তাহার নিবাস, সে কথা স্বীকার করিতে ময়েজদ্দীন ইতস্ততঃ করিতেছিল; এমন সময় হাফজান বলিল, "আমিও বাঙ্গালী। বাঙ্গালা আমার দেশ; কিন্তু আমার জীবনে এই প্রথম বাঙ্গালা-দর্শন।"

ময়েজদ্দীন বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে হাফজানের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল।

হাফজান বলিল, "আমার পিতা বাঙ্গালী—হিন্দু; দিল্লীতে ব্যবসায় করিতেন। আমার জন্মের ছয় মাসের মধ্যে আমার পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হয়। গৃহে যে মুসলমান দাসী ছিল, সেই আমাকে মানুষ করে। পরে, বড় হইয়া আমি পিতার হাতবাক্সে কাগজ-

পত্রে আমার আত্মীয়দিগের সন্ধান পাই, এবং ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হই।"

ময়েজদ্দীন জিজ্ঞাসা করিল, "স্বগ্রাম দেখিতে আসিয়াছিলেন?"

"শুধু তাহাই নহে। আমি মক্কায় যাইব। তৎপূর্ব্বে স্বগ্রামে পিতামাতার নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছায় আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও গিয়াছিলাম। আমি বিধর্ম্মী, আমা হইতে ত সে কার্য্য সম্ভব নহে।"

"এ সঙ্কল্প আপনার মত ধর্ম্মপ্রাণ রমণীরই উপযুক্ত। সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে ত?"

হাফজান দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "না।"

ময়েজ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"যাঁহাদিগকে অর্থ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, তাঁহারা এ কার্য্যের ভার লইতে সম্মত হইলেন না। যাহারা ভার লইতে আগ্রহ দেখাইল, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।"

"খোদা যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। এও তাঁহারই ইচ্ছা। তাঁহার অভিপ্রায় আমরা কি বুঝিব?"

হাফজান ময়েজদ্দীনের মিষ্ট কথায় তুষ্টা ও তাহার ধর্ম্মভাবে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবতী হইল।

৪

দিল্লীতে পঁহুছিয়া পরদিন ময়েজদ্দীন হাফজানের গৃহে গমন করিল। উদ্দেশ্য,—তাহার দয়ার জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ।

ময়েজদ্দীনের কৃতজ্ঞতা কিছু অতিরিক্ত বটে। তাহার পর ময়েজদ্দীনের কিছু ঘন ঘন সে পল্লীতে কায পড়িতে লাগিল। আর কাযে যাইবার সময় সে হাফজানের সংবাদ না লইয়া যাইত না। কখন বা সে হামিদার নিকট সংবাদ লইয়াই চলিয়া যাইত, কখন বা হাফজানের সহিত সাক্ষাৎ করিত। হাফজানের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই সে মন্দির বা মসজিদ নির্ম্মাণের কথা তুলিত। ময়েজদ্দীন বুঝিয়াছিল,—একটা অনুষ্ঠান হইলেই তাহার কিছু লাভ হইবে। ফলেও তাহাই হইল।

ময়েজের প্রতি হাফজানের শ্রদ্ধা ক্রমে বিশ্বাসে ও বিশ্বাস হইতে ঘনিষ্ঠতর ভাবে পরিণত হইল। ক্রমে এমন হইল যে, ময়েজের সঙ্গ তাহার ভাল লাগিতে লাগিল। তাই সেও মসজিদ-নির্ম্মাণাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্যোগী হইল। সে সকল কার্য্যে ময়েজদ্দীন তাহার পরামর্শদাতা।

ক্রমে হাফজানের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; ময়েজের সহিত তাহার ঘন ঘন সাক্ষাৎ সত্য সত্যই আবশ্যক হইয়া উঠিল। এক একটি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে উভয়ে বহুক্ষণ পরামর্শ করিত। ক্রমে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল।

এই সকল অনুষ্ঠান হইতে অর্থলাভমাত্র ময়েজদ্দীনের উদ্দেশ্য। তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে লাগিল।

এ দিকে হাফজান হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিতে লাগিল। তাহার শূন্য হৃদয়ের এক প্রান্তে কোথায় ওয়েসিস সৃষ্ট

হইয়াছিল; তথা হইতে উৎসারিত উৎসের উচ্ছ্বসিত স্ফটিক-বারিরাশি বহিয়া আসিয়া শুষ্ক মরুতে স্নিগ্ধ সরসতার সঞ্চার করিতেছিল। হাফজান আপনি আপনার এই পরিবর্ত্তনে বিস্মিতা হইল; ভাবিল—এ কি? প্রাসাদে বাদশাহের বা বেগমের সাহচর্য্যে সে যে আনন্দ অনুভব করে নাই, আমীর ওমরাহের গৃহে আপ্যায়নে সে যে তৃপ্তি পায় নাই, এখন বঙ্গদেশাগত, অজ্ঞাতকুলশীল ময়েজদ্দীন দারোগার সাহচর্য্যে সে তাহা লাভ করিল! যৌবনের উচ্ছল জলে তাহার যে হৃদয় কম্পিত করিতে পারে নাই, এখন শান্ত স্রোতে তাহা অনায়াসে কম্পিত হইল! এখন নারী-হৃদয় অভ্যাসের, শিক্ষার, সংযমের, সঙ্কল্পের সকল বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল! সে কথা মনে করিয়া তাহার আপনার হাসি আসিত। কিন্তু সে সহজেই বুঝিতে পারিল, তাহার অবস্থা আর হাসিয়া উড়াইবার উপায় নাই।

হাফজান মধ্যে মধ্যে ময়েজদ্দীনের গৃহেও যাইত; তাহার পত্নীকে ও সন্তানদিগকে কত অলঙ্কার দিত। ময়েজদ্দীনের তাহাও লাভ।

এই ভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। ময়েজদ্দীনের প্রতি হাফজানের মনোভাব ক্রমে অনুরাগে পরিণত হইল।

৫

দিল্লীর প্রাসাদে বৃত্তিভোগী বাদশাহ বাহাদুর শাহের বেগম কুশাগ্র-বুদ্ধি জিনাত-মহল ভারতব্যাপী বিপ্লবের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া পুল-

কিত হইতেছিলেন ; এবং সেই বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য অবিরত ষড়যন্ত্র ও অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছিলেন। তিনি সম্ভাবিত-সাফল্য সন্তুষ্টচিত্তে দেখিতেছিলেন, ইংরাজের একমাত্র অবলম্বন—প্রধান বল ভারতীয় সৈনিকদল দেশের সাধারণ লোকেরই মত ইংরাজের উপর অসন্তুষ্ট, বিদেশীর শাসন-যন্ত্র বিকল করিতে উদ্যত। তিনি জানিতেন,—ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও আনুষঙ্গিক দানাদিতে দিল্লীর জনসাধারণের উপর হাফজানের অসাধারণ প্রভাব। তিনি হাফ-জানকে ষড়যন্ত্রে সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছিলেন।

যখন চারি দিকে অসন্তোষ প্রবল হইয়া উঠিল, কেবল ইংরাজ ব্যতীত আর সকলেই তাহা জানিল, তখন কামানের রঞ্জুতখরে অগ্নি-যোগ করা হইল। ভারতবাসী তখনও নিজস্ব বিসর্জ্জন দেয় নাই ; তাহার সব সহিত, ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ সহিত না। তখন অপবিত্র চর্ব্বিলিপ্ত 'টোটা কাটা'র কথা প্রচারিত হইল। যাহারা সিপাহী-বিপ্লব গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহারা বুদ্ধিমান লোক ; তাহার পরের কার্য্যভার যাহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহারাই স্বকর্ম্মসাধনে অপটু ছিল।

৬

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। দিল্লীর প্রাসাদে একটি কক্ষে বেগম ও হাফ-জান—দুই জন। বেগম মধ্যে মধ্যে উঠিয়া দ্বার পর্য্যন্ত যাইতেছেন। তিনি যেন অস্থির হইয়া উঠিতেছেন। বহুক্ষণ এই ভাবে গেল। উভয়েই উৎকর্ণ। বেগম একবার উঠিয়া মুক্ত ছাতে আসিয়া

দেখিলেন, আকাশে দুই একখানা মেঘ জমিতেছে। তিনি ঘরে আসিয়া বলিলেন, "হাফজান! মেঘ উঠিতেছে; কি জানি কি হয়!" বেগমের গলা ধরিয়া আসিতেছিল।

এই সময় বোধ হইল, কে সোপান অতিক্রম করিতেছে। দুই জনেই কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সর্দ্দার খোজা বেগমকে কুর্নিশ করিয়া এক খানি পত্র দিল। বেগম উন্মাদিনীর মত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দীপালোকে পত্র পাঠ করিলেন; আনন্দে হাফজানকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। পত্রে মিরাটে বিপ্লব-সূচনার সংবাদ ছিল।

হাফজান আর বিলম্ব করিল না; নামিয়া আসিয়া শিবিকায় আরোহণ করিল।

৭

হাফজানের গৃহে দিল্লীর জনসাধারণের নায়কগণ অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের সঙ্গে ইংরাজ সেনাদলের কয় জন হাবিলদারও ছদ্মবেশে আসিয়াছিল।

হাফজান তাহাদিগকে সংবাদ দিল। সকলেরই মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। তাহারা বহুক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ করিল;—পর দিনের কার্য্যপ্রণালী স্থির হইল।

তাহারা যখন বিদায় লইল, তখন মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের যাইবার সময় হাফজান হামিদাকে ডাকিল; তাহাকে দেখাইয়া সকলকে বলিল, "যদি শত্রুপক্ষীয়দিগের কাহারও

গৃহে আমার এই পরিচারিকাকে ফিরোজা ওড়না উড়াইতে দেখ, তবে সে গৃহ আক্রমণ করিও না ; তাহার বিশেষ কারণ আছে, জানিবে।”

তাহারা চলিয়া যাইবার পর হাফজান বহুক্ষণ কি ভাবিল ; তাহার পর হামিদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “শিবিকাবাহকগণ চলিয়া গিয়াছে কি ?”

হামিদা জানিয়া আসিয়া জানাইল,—তাহারা তখনও অপেক্ষা করিতেছে।

সেই রাত্রিতে হাফজান ময়েজদ্দীনের গৃহে আসিল। হায় রমণী-হৃদয় !

হাফজান সরল বিশ্বাসে ময়েজদ্দীনকে সকল কথা বলিল ; শত্রুকে সকল সন্ধান দিল ! নারী-বুদ্ধি যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিল, নারী-বুদ্ধিই তাহার সর্ব্বনাশের আয়োজন করিল।

হামিদাকে সেই গৃহে রাখিয়া হাফজান ফিরিয়া আসিল।

এ দিকে ময়েজদ্দীনও বাহির হইয়া গেল।

৮

পর দিন প্রভাত হইতে না হইতে নগরে অস্ত্র ঝন্‌ঝনা শ্রুত হইল ; বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল ; দিকে দিকে বাদশাহের জয়ধ্বনি হইতে লাগিল ; দিল্লী জাগিয়া উঠিল। ইংরাজগণ ব্যস্ত হইয়া আগুন দিয়া বারুদ-ভাণ্ডার উড়াইয়া দিল। সে শব্দ সে দিন প্রমত্ত দিল্লী-বাসীর নিকট মুক্তির আহ্বান বলিয়া বোধ হইল।

এই মুক্তির কামনা যখন শিশুমাত্র থাকে, তখন তাহাকে স্তন্যদানে বদ্ধিত করিতে হয়, তখন সে যদি দুগ্ধের পরিবর্ত্তে রক্তের জন্য কাঁদিতে থাকে, তবে তাহাকে রক্তদান ব্যতীত আর উপায় কি? দিল্লীর পথে সে দিন রক্তপাত হইয়া গেল।

প্রমত্ত জনগণ ইংরাজ শিবিরের পর ইংরাজের কর্ম্মচারী ও সহায়দিগের গৃহ আক্রমণ করিতে চলিল। রাজপথ সশস্ত্র জনগণে পূর্ণ; দিল্লী বাদশাহের জয়ধ্বনিতে ধ্বনিত।

কয়টি গৃহ লুণ্ঠনের পর লুণ্ঠনরত জনগণ ময়েজদ্দীন দারোগার গৃহদ্বারে উপনীত হইল। নায়কগণ দেখিল,—গৃহ-শিরে হাফজানের পরিচারিকা ফিরোজা ওড়না উড়াইতেছে! তাহারা আদেশ করিল,—কেহ সে গৃহ লুণ্ঠন করিতে পারিবে না। জনতা হতাশ হইল, কিন্তু সে আদেশ অবহেলা করিতে পারিল না। তখনও তাহারা বিজয়গর্ব্বমদিরাপানে জ্ঞানহারা হইয়া আপনাদের সর্ব্বনাশের বীজ বপন করে নাই। নায়কগণ ভাবিল, বুঝি ময়েজদ্দীন বাদশাহের পক্ষ। ময়েজদ্দীনের গৃহের একখানি ইষ্টকেও কোনরূপ আঘাত লাগিল না।

৯

চারি মাস কাটিল। জিনাতমহল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত মোগল-প্রাধান্য স্থায়ী করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিরাম নাই,—বিশ্রাম নাই। সঙ্গে সঙ্গে হাফজানেরও বিশ্রাম নাই। কিন্তু উপযুক্ত সেনানায়কের অভাব, সেনাদলগঠনক্ষম লোকের অভাব দূর হইল না।

এই সময় দিল্লীর পথে পথে আবার রক্তধারা বহিতে লাগিল। ধীরে ধীরে ইংরাজ নষ্ট অধিকার পুনরায় লাভ করিতে লাগিল। বাবরের অকুতোভয় সঙ্গীদিগের রক্তে ভারতে মোগল-সিংহাসনের যে ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ছয় দিন যুদ্ধের পর সব ফুরাইল; দেশ-বিজয়ী মোগলের ম্লানতেজ প্রতাপ-তপন অস্তগত হইল।

তাহার পর পিশাচ হডসন স্বহস্তে বাবরের বংশের শেষ আশা—স্ফুটনোন্মুখ-কুসুমোপম বাহাদুর শাহের পুত্রদিগকে নিহত করিল; মুসলমানের কিরীট পদাঘাতে ধূলিলুণ্ঠিত করিল। সেই পৈশাচিক আদর্শে ইংরাজের সেনা ও কর্ম্মচারীদিগের ভীষণ প্রতিহিংসা-বৃত্তি ভীষণতর হইয়া উঠিল; তাহারা প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইয়া বাহির হইল।

তাহারা প্রথমেই হাফজানের গৃহে আসিল। গৃহদ্বার রুদ্ধ; তাহারা দ্বার খুলিতে বলিল। দ্বার মুক্ত হইল না; কিন্তু দ্বিতলে একটি বাতায়ন-কপাট মুক্ত হইল। সেই বাতায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া হাফজান স্থিরকণ্ঠে বলিল, "তোমরা কি চাহ? আমার জীবন থাকিতে তোমরা এ গৃহে প্রবেশ করিতে পাইবে না। বাদশাহের জন্য প্রাণ দিব—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। প্রাণ দিব, কিন্তু প্রাণ থাকিতে তোমরা আমার অপমান করিতে পারিবে না।—"

ময়েজদ্দীন বন্দুক তুলিয়াছে দেখিয়া হাফজান নীরব হইল। পাছে কেহ কিছু মনে করে বলিয়া ময়েজদ্দীন সর্ব্বাগ্রে বন্দুক তুলিয়াছিল।

হাফজান স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের রোষভাব বিস্ময়ে পরিণত হইল, ওষ্ঠাধরে যেন অতি মৃদু ম্লানহাসি ফুটিয়া উঠিল।

নিম্নে জনতা মূক হইয়া দেখিতে লাগিল।

ইংরাজ সেনাপতি গুলি চালাইবার আদেশ দিতে না দিতে ময়েজদ্দীন বন্দুক ছাড়িল। হাফজান যেন বক্ষ বাড়াইয়া দিল। পর মুহূর্ত্তে বিদীর্ণহৃৎপিণ্ড হাফজানের মৃতদেহ হর্ম্ম্যতলে পতিত হইল। দানবের অকৃতজ্ঞতায় ও রমণীর রক্তে শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা রঞ্জিত হইয়া রহিল।

কোথায় ?

১

সকল দিক দেখিয়া, সকল কথা বিবেচনা করিয়া কায করা ভাল হইলেও, সব সময় তাহা সম্ভব হয় না। তাই একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ-বলে সুরেন্দ্রনাথ যখন শৈলবালাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন সে সকল দিক দেখিয়া, সকল কথা বিবেচনা করিয়া কায করিতে পারে নাই। তখন তাহার বয়সই বা কি ? সে সবে কুড়ির ঘরে পা দিয়াছে, তাহার হৃদয়ে তখন যৌবনের পূর্ণ অস্থিরতা। আর নহিলেই বা কে সর্ব্ববন্ধনবিরোধী চপল কুসুমায়ুধের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে ?

সেই প্রথম যৌবনে কুটুম্বকন্যা শৈলকে দেখিয়া সুরেন ভাবিল যে, তাহার দৃষ্টিতে এমন একটা কিছু আছে, যাহা একবার দেখিলে আর ভুলিতে পারা যায় না। অথচ তাহাতে তীব্রতার লেশমাত্র নাই, সে যেন তারকার মাধুরীময় সলজ্জ কোমল জ্যোতিঃ। শৈল যখন কথা কহিত, তখন বসন্তপবনস্পর্শে পাদপপত্রের মত তাহার হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিত। তাহার পূর্ব্বেও সে শৈলকে দেখিয়াছে; কিন্তু তখন এত কিছু মনে হয় নাই। জীবনের এক শুভ মুহূর্ত্তে হয় ত একটা কথায়, একবার দৃষ্টিতে,

অধরপ্রান্তে এতটুকু মৃদুহাস্যে, হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব বহু ভাব বিকশিত হইয়া উঠে; ফুটিবার ঠিক সময় নহিলে কোরক কুসুমে বিকশিত হয় না।

বর্ষাবারিরাশিস্ফীত স্রোতস্বতীর মত তাহার প্রেম ক্রমেই গভীরতর ও প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। আশা ও আশঙ্কা তাহার যৌবনলাবণ্যপূর্ণ মুখে আপনাদের চিহ্ন অঙ্কিত করিল।

তখন তাহার মাতার প্রতিবেশিনীগণ তাঁহাকে জানাইলেন যে, আর ছেলের বিবাহ না দিলে ভাল দেখায় না; বিবাহের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়াই ছেলে অমন হইয়া যাইতেছে।

২

সুরেনের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ ঘরে আনেন, এ ইচ্ছা সুরেনের জননীর অনেক দিনই হইয়াছিল। কিন্তু এ তিন বৎসর এত বলিয়া কহিয়াও তিনি কিছুতেই ছেলেকে বিবাহে সম্মত করাইতে পারেন নাই। সে কথা বলিলেই সে বলিত,—"আরও কিছুদিন যাউক;" বিশেষ অনুরোধ হইলে সে বলিত, "আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিয়া আমাকে অসুখী করাই যদি তোমাদের অভিপ্রায় হয়, তবে সেই চেষ্টা কর। আমি কিছুতেই এখন বিবাহ করিব না।"

ইতঃপূর্ব্বেই সুরেনের দুই ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল; তাঁহারা শ্বশুরালয়ে থাকিতেন। বাড়ীতে মা, আর বৃদ্ধা পিসীমা; সে জোর করিয়া 'না' বলিলে তাঁহারা আর জিদ করিতে সাহস করিতেন না। ভগিনীরা পিত্রালয়ে আসিয়া সে কথা পাড়িলে সুরেন তাহা আমলেই

আনিত না। কাযেই তাঁহারা কেবল স্বামিগৃহে যাইবার সময় মা'কে বলিয়া যাইতেন, "উহার কথা শুনিও না, মা; মা দেখিয়া বিবাহ দিবেন, ছেলের আবার মতামত কি ?"

এবার মা জিদ ধরিলেন যে, তাহাকে বিবাহ করিতেই হইবে। সুরেন তত আপত্তি করিল না। শৈলকে বিবাহ করিতে যে সুরেনের ইচ্ছা ছিল, বোধ হয়, মা সে সন্দেহ করিয়াছিলেন। ছেলের নাড়ী নক্ষত্র মা যেমন জানেন, তেমন আর কে জানে ? মা প্রথমেই সুরেনের সহিত শৈলের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। শৈলবালার অভিভাবকের তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল। কিন্তু যে সংসারে এক জন পুরুষ কর্ত্তার অভাব, সে হিন্দু-সংসারে সকল কার্য্যেই বড় গোলযোগ। দশ জন আত্মীয়স্বজনের মতামত লইয়া কার্য্য করিতে হয়, অথচ সে দশ জনের এক জনও কাযটা ঠিক আপনার ভাবেন না; পরস্পর পরস্পরের উপর বরাৎ দিয়া চলিতে চাহেন; সুতরাং অনেক পণ্ডিতে ব্যবস্থা নষ্ট হয়। এখানেও সেই বিপদ হইল; সুরেনের মাতা জামাতাদিগের মত করাইতে পারেন ত দূরসম্পর্কীয় দেবরদিগের মত হয় না; আবার তাঁহাদিগের যদি মত হয়, তবে ভাশুরেরা বলেন—ভাবিয়া দেখি। আবার কথাটা অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা না হইলেই সকলের রাগ আছে।

বিক্ষিপ্ত আলোকরাশি এক বিন্দুতে সম্মিলিত হইলে যেমন তাহার দাহকারী শক্তি প্রকাশ পায়, তেমনই এই সকল বিভিন্ন-দিকগামী মত এক সিদ্ধান্তে সম্মিলিত হইলে তবে কার্য্য স্থির হয়;

কিন্তু এই সকল 'নানা মুনির নানা মত' এক সিদ্ধান্তে সম্মিলিত করা অসাধ্যসাধন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

সুরেনের মাতার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও শীঘ্র কিছুই স্থির হইল না। নানা মুনির নানা মতে—গড়িমিসিতে ক্রমে মাসের পর মাস কাটিয়া গেল।

৩

ছেলের বিবাহ যত দিন ইচ্ছা স্থগিত রাখা চলে; কিন্তু হিন্দুর ঘরে মেয়ের বিবাহে তাহা হয় না। তাই যেমনই হউক, হিন্দুর মেয়ের বিবাহ এক রকম না এক রকম করিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়—বাধিয়া থাকে না।

এ দিকে শৈলের অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে, মাসের পর মাস যায়, অথচ সুরেনের আত্মীয়স্বজনদিগের মত স্থির হয় না, সুরেনের মাতা ভরাভর দিতে পারেন না, তখন তাঁহারা ভাবিলেন, আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে; কারণ, তাঁহাদের কন্যাদায়। কাযেই তাঁহারা অন্য পাত্রের অন্বেষণে চেষ্টিত হইলেন।

ইহার পর এক টুকরা লাল কাগজ যথাসময়ে সুরেনকে জানাইল যে, অমুক দিন অমুকের পুত্র শ্রীমান্ অমুকের সহিত শৈলবালার শুভ বিবাহ হইবে, বিবাহস্থলে সবান্ধবে তাহার উপস্থিতি প্রার্থনীয়। পত্রখানা পাইয়া প্রথমে সুরেন ভাবিল যে, তাহাকে এ শুভকর্ম্মে নিমন্ত্রণ করা বড় নিষ্ঠুরতার কার্য্য; কিন্তু সে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিল যে, ইচ্ছা করিয়া তাহার মনে ব্যথা দেওয়া কাহারও উদ্দেশ্য

নহে। তবে ইহাতে নিষ্ঠুরতা কি? তবুও তাহার মনে কেমন একটা খট্‌কা রহিয়া গেল; যুক্তি বলিল,—ইহা নিষ্ঠুরতা নহে; কিন্তু হৃদয়ের যেখানে দারুণ বেদনা অনুভূত হইতেছিল, সেখান হইতে তবুও যেন কে বলিতে লাগিল,—নিষ্ঠুরতা ভিন্ন ইহা আর কি? যাহাই হউক, তাহার হৃদয়ে একটা বড় বেদনা বোধ হইতে লাগিল।

হতাশা, বেদনা, নিষ্ফল আক্রোশ, এই সকল মিলিয়া তাহার মনে কেমন একটা আকুলতা উৎপন্ন করিতে লাগিল।

ক্রমে শৈলবালার বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। দিন কাহারও সুখ-দুঃখের জন্য অপেক্ষা করিতে শিখে নাই। সুরেনের শরীরের ও মনের অবস্থা এমনই দাঁড়াইল যে, সে আর কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে স্থির করিয়াছিল যে, সে বিবাহবাড়ী যাইবে না; কিন্তু আজ তাহার মনে হইল যে, সে না যাইলে ভাল দেখাইবে না,—বিশেষ সে না যাইলে যদি কেহ কিছু মনে করে! কেহ কিছু মনে করিবার এই সম্ভাবনাটা আজ সহসা কেন তাহার মনে হইল, তাহা স্থির করা দুষ্কর। অন্য দিন হইলে সে বুঝিতে পারিত যে, তাহার না যাইবার একটা সামান্য কৈফিয়ৎ দিলে, কেহই বিশেষ কিছু মনে করিবে না; কিন্তু আজ কোথা হইতে এতটুকু লজ্জা তাহার হতাশাব্যাপ্ত হৃদয়ের এক নিভৃত কোণ হইতে বলিতেছিল,—আসল কথাটা যদি কেহ বুঝিতে পারে!

কাযেই নিয়মিত সময়ে, সে সেই সন্ধ্যাদীপালোকিত গৃহে প্রবেশ

করিল; প্রবেশ করিল, অথচ বিশেষ কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না।

অন্ধকার হৃদয়ে সেই আলোকোজ্জ্বল গৃহ হইতে স্বগৃহে ফিরিবার সময় তাহার মনে হইতে লাগিল,—সে কি দেখিয়া আসিল—শৈলের বিবাহ; না আপনার সকল আশার সমাধি?

গৃহে আসিয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে একখানা আরাম-কেদারায় শ্রান্তভাবে পড়িয়া সুরেন কত কি ভাবিতে লাগিল। সম্মুখে তাহার হৃদয়ের অন্ধকারের মত অনন্তপ্রসারিত অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে মধ্যে যে আলোক দৃষ্ট হইতেছে, তাহার হৃদয়ে সেইরূপ আশার ক্ষীণ আলোক আছে কি? আছে; —নহিলে জীবনের উপর তাহার কিছুমাত্র মমতা থাকিত না। কিন্তু সে কথা তখন তাহার মনে হইল না। নৈশ বায়ুর শন্ শন্ শব্দে সে যেন কাহার করুণ ক্রন্দনের কাতরস্বর শুনিতে লাগিল। আমরা মনের অবস্থানুসারে জড় প্রকৃতিকেও বিচার করি; তাই এই দুঃখের সময় তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন প্রকৃতির চির-মাধুরীময় রঙ্গমঞ্চেও কে বিষাদের যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছে।

সুরেন কত কি ভাবিতে লাগিল; সবই যেন কেমন গোলমাল বোধ হইতে লাগিল। এইরূপ সময়ে হৃদয় সহজেই অতীত কথা ভাবিতে ভালবাসে; কিন্তু যে অতীত-সরসীসলিলে আমরা আমা-দিগের পূর্ব্বস্মৃতি নিমজ্জিত রাখি, তাহার জলরাশি বড় অল্প আলো-ড়নেই আবিল হইয়া উঠে;—তখন কেবল একটা অস্পষ্ট আকু-

লতাই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। সারা রাত্রি স্থরেনের নিদ্রা হইল না; নিশাশেষে শীতল সমীরণ যখন তাহার স্বেদসিক্ত ললাট স্পর্শ করিতে লাগিল, তখন তাহার একটু তন্দ্রা আসিল।

প্রভাতে জাগিয়া স্থরেন দেখিল, চার পেয়ালা লইয়া তাহার ভৃত্য তাহাকে ডাকিতেছে,—সেই ডাকেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে,—অম্লানোজ্জ্বল রবিকরে প্রকৃতি হাসিতেছে।

তাহার পর দিন কাটিতে লাগিল; কিন্তু নিদ্রান্তে দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত একটা বেদনা স্থরেনের হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া রহিল। মা বিবাহের কথা পাড়িলে "হইবে", "ব্যস্ত কি" বলিয়া সে বিলম্ব করিতে লাগিল। এবার আর মা'র কাছে "বিবাহ করিব না" বলিতে সাহস হইল না।

৪

এক বৎসর কাটিয়া গেল। স্থরেন বিবাহ করিল না। দ্বিতীয় বৎসরে মা অনুরোধ ছাড়িয়া অশ্রুর আশ্রয় লইলেন। জননী সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র স্নেহময়ী জননী। কালে স্থরেনের হৃদয়ক্ষতের বেদনা যেন একটু কমিয়া গেল।

আমরা কোন কার্য্যে যত দিন ইচ্ছা বিলম্ব করিতে পারি; কিন্তু সকলে তাহা করে না।—মৃত্যু কখনও বিলম্ব করে না। দ্বিতীয় বৎসরে প্রথমে পিসীমার মৃত্যু হইল; তাহার অল্প দিন পরে তাঁহার বহু দিনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, মাও সকল ইচ্ছার অতীত লোকে গমন করিলেন।

মাতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসিয়া সুরেন ভাবিল,—কি করিলাম! মা'র একটা ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম না! আমার এ দুঃখ যে মরিলেও যাইবে না! মাতার মৃত্যুর পর চিরদীপ্ত হুতাশনের মত তাহার হৃদয়ে অনুতাপ জ্বলিতে লাগিল। মা'র একটা প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ করে নাই ভাবিয়া সে বড় অনুতপ্ত হইল। আবার মাতার মৃত্যুর সহিত তাহার সংসারের শেষ বন্ধনও ছিন্ন হইয়া গেল। যে অবস্থায় সংসারে বিশেষ আকর্ষণ থাকে না, মানবের সে অবস্থা বড় সুখের নহে। অবলম্বিত ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়া, সে তাহার যাতনা ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু হৃদয়ের একটা অংশ যদি শূন্য থাকে, তবে অন্য সকল অংশ কানায় কানায় পূর্ণ থাকিলেও, সেই শূন্য অংশের শূন্যতা তাহাতে দূর হয় না। হৃদয়ের যে অংশটা সর্ব্বাপেক্ষা কোমল, যে অংশ পূর্ণ হইলে হৃদয় মাধুরীময়, জীবন সুখময় হইত, সুরেনের হৃদয়ের সেই অংশটাই শূন্য ছিল। তাই সেই অংশ হইতে রৌদ্রতপ্ত মরু-বায়ুর হাহুতাশের মত একটা অভাবব্যঞ্জক ভাব সর্ব্বদাই উঠিয়া আকুল শূন্যতা জ্ঞাপন করিত। সুরেন দেখিল, ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মনোযোগ দিলেও সে শূন্যতা পূর্ণ হয় না। একের অভাব অন্যে নিবারিত হইতে পারে না। চিরদীপ্ত রাবণের চিতার মত সেই শূন্যতা লইয়া সুরেনের আর এক বৎসর কাটিয়া গেল।

৫

এই সময় আর একটা ঘটনা ঘটিল।

কোথায় ?

শৈলের স্বামী কোনও আফিসে খাজাঞ্চীর কায করিতেন। তিনি তহবিল তছরূপের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। নিম্ন আদালত হইতে মোকর্দ্দমা দায়রায় গেল—জামীনের আবেদন গ্রাহ্য হইল না।

এই বিপদের সময় শৈল পিত্রালয়ে আসিল। সুরেন আইন-ব্যবসায়ী; শৈলের পিতা তাহাকে ডাকাইয়া মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুরেন মোকর্দ্দমার সকল ভার লইল। সজলনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া শৈল বলিল, "দয়া করিয়া যাহা করিতে হয় কর।"

প্রায় তিন বৎসর পরে সেই দিন শৈলের সহিত সুরেনের আবার দেখা হইল। যেন একটা নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নি পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বর্ষাবারিপাতে নিদাঘতাপতপ্তা শীর্ণাঙ্গী স্রোতস্বিনীর হৃদয়ে প্লাবনের মত, কত ভাবনা যে সুরেনের হৃদয় প্লাবিত করিয়া তুলিল, তাহা বলা যায় না।

সেই দিন গৃহে ফিরিয়া সুরেন আপনার কক্ষে গিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। শৈলের সেই অশ্রুপূর্ণ, সহায়তাপ্রার্থী, কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ নয়ন যেন শিশিরসিক্ত নলিনী। জানি না অশ্রুতে কি আছে, কিন্তু অশ্রুতে যে সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, শত আভরণেও তাহা হয় না; অশ্রুর নিকট সকল আভরণ ম্লান হইয়া যায়। বুঝি এই শোকতাপময় জগতে হাসির অপেক্ষা অশ্রুই অধিক স্বাভাবিক;—তাই অশ্রু এত ভাল লাগে। সুরেন ভাবিল, হায় জীবনের গতি যদি ফিরিত!

তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে অতীতের অন্ধকার যবনিকা যেন অপসৃত হইয়া গেল ; সে তাহার অতীত জীবনের ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। সমস্ত দিন সে কোনও কায করিতে পারিল না। নিশীথে শয়নকক্ষে মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে বসিয়া সুরেন কত কি ভাবিতে লাগিল,—সে ভাবনার কি অন্ত আছে ? আকাশে মেঘ-সমাগম হইতে লাগিল, কালো মেঘের উপর কালো মেঘ তারকাবহুল অম্বর ছাইয়া ফেলিল। তাহার পর ঝড় উঠিল। সুরেন উঠিয়া বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া আবার ভাবিতে লাগিল। তাহার হৃদয়েও ঝটিকা বহিতেছিল।

বারিপাত আরব্ধ হইল ; বাতায়নপার্শ্বে পবন আর্ত্ত চীৎকার করিতে লাগিল ; বৃষ্টিবিন্দু বাতায়নপথে প্রবেশ প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রাণহীন নীরব নিশ্চল মূর্ত্তির মত সুরেন স্থির।

যাহা হউক, সুরেন নিশ্চয় বুঝিল যে, অতীতস্মৃতি হৃদয় হইতে অপনীত হইবার নহে।

৬

মোকর্দ্দমার দিন শৈলের স্বামী আদালতে দেখিলেন, তাঁহার পক্ষে মোকর্দ্দমা তদ্বিরের কোনই ক্রটী হয় নাই। কে এত করিল ? তিনি ভাবিলেন, শৈলের পিতাই সব করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আত্মীয় কুটুম্ব ত আর কেহ নাই !

মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল।

দুই দিনে মোকর্দ্দমার বিচার শেষ হইয়া গেল ; শৈলের স্বামী

বেকসুর খালাস পাইলেন। সে সুখসংবাদ তাঁহার নিকট এতই অপ্রত্যাশিত বোধ হইতেছিল যে, তাহা যেন আঘাতের মত আসিল। তবে আনন্দাতিশয্য দুঃখাতিশয্যের মত অনিষ্টকর নহে।

খালাস পাইয়া তিনি কে তাঁহার পক্ষে তদ্বির করিয়াছেন, জানিবার জন্য যে ব্যারিষ্টার তাঁহার পক্ষে ছিলেন, তাঁহার নিকট যাইয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শৈলের স্বামী জিজ্ঞাসা করিলে ব্যারিষ্টার আদালতের অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট এক জন ভদ্রলোককে দেখাইয়া দিলেন। শৈলের স্বামী দেখিলেন, এক জন অপরিচিত ব্যক্তি। তথাপি তাঁহার কাছে সকল সংবাদ লইতে ও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে তিনি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু তিনি তাঁহার দিকে আসিতেছেন দেখিয়া, সেই অপরিচিত ব্যক্তি উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহাকে না পাইয়া শৈলের স্বামী গৃহে গমন করিলেন।

স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া শৈল খানিকটা আনন্দের কান্না কাঁদিল। তাহার পর সে স্বামীকে এ কয় দিনের সকল ঘটনা বলিল। —তাহার ভাবনা ও পিত্রালয়ে গমন,—সুরেনের মোকর্দ্দমার ভার লওয়া, সে একে একে স্বামীকে সকল কথা বলিল।

* * * * * *

পর দিবস ধন্যবাদ দিবার অভিপ্রায়ে সুরেনের বাড়ী যাইয়া শৈলের স্বামী শুনিলেন,—সুরেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

শৈল পিত্রালয়ে আসিল। শৈলের পিতা ও তাহার ভগিনীপতি-

দ্বয় সুরেনের যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না—সে কোথায় গিয়াছে। সে আপনার গমনের চিহ্নমাত্র রাখিয়া যায় নাই।

অসীম সাগরে ক্ষুদ্র জলবিম্ব যেমন ভাসিয়া যায়, তেমনই অসীম জন-সমুদ্রে সুরেন কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা নির্ণীত হইল না। দুই চারি দিন কেহ কেহ তাহার কথা লইয়া আন্দোলন করিল; সে কেন গেল, কোথায় গেল, এই সকল সম্বন্ধে আপন আপন অদ্ভুত মত প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার পর নানা নূতন চিন্তায় তাহারা সে সকল কথা ভুলিয়া গেল। সুরেনের স্মৃতি তাহাদিগের নিকট নিশার অর্দ্ধেকদৃষ্ট স্বপ্নের স্মৃতির মত অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল।

শৈলের স্বামী আর এক স্থানে চাকরী পাইয়া আফিসের কাযে, সংসারের ঝঞ্ঝাটে আপনার কৃতজ্ঞতার ঋণের কথা সহজেই বিস্মৃত হইলেন। কেবল তাহা স্মরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে একটি বেপমান রমণীহৃদয় হইতে দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া পবনে মিশিয়া যাইত; আর সে আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিত,—"কোথায়?"

দুরাশা।

১

যখন দারিদ্র্যও মানবের উচ্চ আশার বিস্তার রোধ করিতে পারে না, তখন মধ্যবিত্ত হাচিন্স দম্পতির পক্ষে একমাত্র সন্তান জর্জ্জকে সুশিক্ষিত করিয়া তাহার সম্পদ ও সম্মানলাভের পথ মুক্ত, প্রসারিত ও সুগম করিবার চেষ্টা নিন্দনীয় বলা যায় না। জর্জ্জের পিতা মফঃস্বল সহরে ব্যাঙ্কে চাকরী করিতেন ; যে বেতন পাইতেন, তাহাতে সংসারে কখনও অভাব অনুভূত হয় নাই। তাহার মাতা ব্যাঙ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষের দুহিতা। যৌবনে তিনি রূপলাবণ্য হেতু সহরের সমাজে সুপরিচিতা ছিলেন। কিন্তু জর্জ্জের পিতা রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। পিতার মৃত্যু-শয্যায় কন্যার অকাতর শুশ্রূষায় বিস্মিত হইয়া তিনি তাঁহাকে দেবী-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন। সেই শ্রদ্ধা তাঁহাকে জর্জ্জের ভাবী জননীর প্রতি আকৃষ্ট করে। তাহারই ফলে—উভয়ে পরিণয়।

সহরের বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া জর্জ্জ দূরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিল। জর্জ্জ যে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা করিল, সেদিন তাহার পিতামাতা ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবাদি তাহাকে বিদায় দিতে রেলওয়ে-ষ্টেশনে আসিলেন। যখন গাড়ী ছাড়িয়া দিল, তখন দুই জন

রমণী ছলছল নেত্রে যত দূর দেখা গেল, সেই গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন,—জর্জ্জ গাড়ীর বাতায়ন-পথে রুমাল নাড়িতেছে, দেখিতে লাগিলেন। গাড়ী অদৃশ্য হইয়া যাইলে উভয়েই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এক জন জর্জ্জের স্নেহময়ী জননী, অন্য জন তাহার প্রতিবেশিকন্যা হেলেন।

পরিচিত সহরের পরিচিত ষ্টেশন যখন অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন জর্জ্জ গাড়ীতে স্থির হইয়া বসিল। যুবক প্রবীণত্ব-প্রাপ্তির ভাণ করে। তাই এত ক্ষণ জর্জ্জ সংসারসংগ্রামে অপগতযৌবনমনো-বেগ, স্থির, প্রবীণবয়স্কের গাম্ভীর্য্যের অনুকরণ করিয়াছিল। সে আর পারিল না। উদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাহার নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। জননীর কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আর হেলেনের মুখ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। বিদায়কালে তাহার কাতর মুখচ্ছবি, অশ্রুসজল নয়নের করুণভাব,—সে কি ভুলিবার? যৌবনে—যখন মনোবৃত্তির প্রথম উন্মেষ, পারিজাতকুসুমগন্ধা-মোদিত হৃদয়-নন্দনে যখন নবাগত বসন্তের প্রথম বিহগকূজন, তখন অনাবিল প্রেম শৈশব-সহচরীর ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ, প্রীতিস্নিগ্ধ আয়ত-লোচনে যে দিব্য দীপ্তি দর্শন করে, তাহা জীবনে আর কখনও দর্শন করা যায় না। তখন প্রেম অবলম্বনের সন্ধান করে, এবং প্রথম প্রাপ্ত অবলম্বনকে বেষ্টন করিয়া আপনার সৌন্দর্য্যে তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলে, এবং সেই সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধ হয়।

হেলেন বয়সে জর্জ্জের অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। শৈশব

হইতে উভয়ে একত্র খেলা করিয়াছে। জর্জ্জ যখন কণ্টকতরু হইতে কুসুম তুলিয়া রক্তাক্তহস্তে হেলেনকে তাহা দিত, তখন হেলেন জল আনিয়া তাহার হস্ত ধৌত করিয়া দিত; সে যখন পুষ্পমধুপানমত্ত প্রজাপতির পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিত, তখন হেলেন তাহার শক্তি দেখিয়া বিস্মিতা হইত; সে যখন নদীসৈকতে বসিয়া হেলেনকে নদী, পর্ব্বত, তারকা প্রভৃতির সম্বন্ধে নবলব্ধজ্ঞানের কথা বলিত, তখন হেলেন তাহার বিদ্যার গভীরতায় মুগ্ধ হইত। এমনই ভাবে এত দিন কাটিয়াছে। ইহার মধ্যে কবে যে হেলেনের কোমল হৃদয়ে অজ্ঞাতে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সে তাহা জানিতে পারে নাই। আজ তাহার ষোড়শ বর্ষ বয়সে—যখন তাহার বাল্যকাল কেবল যৌবনে আসিয়া বিকশিত হইয়াছে, অথচ যৌবন তাহার আত্মবিকাশ সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারিতেছে না, সেই সময়, এই বিচ্ছেদবেদনায়—বর্ষাবারিপাতে ধরণীর স্নিগ্ধ শান্তি ও শ্যামশোভার মত—তাহার যৌবন ও প্রেম উভয়েই আত্মপ্রকাশ করিল।

জর্জ্জের হৃদয়েও সে প্রেমের ছায়া পড়িয়াছিল; নহিলে আজ যাইবার সময় হেলেনের কাতর মুখচ্ছবি কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল কেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া প্রথম প্রথম জর্জ্জের মন তাহার সেই দূর গৃহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। যুবকদল-সংসর্গে সে ভাব শীঘ্রই দূর হইয়া গেল। তাহার পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইল। গৃহে

শাসন ও সংযম,—বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার। গৃহে পিতামাতার স্নেহসতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদাই তাহাকে লক্ষ্য করিত, এখানে কতকগুলি বাঁধা নিয়ম মানিয়া চলা ব্যতীত সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। বরং যুবকদলে সেই সকল নিয়ম-লঙ্ঘনও প্রশংসিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে অসাধারণমনীষা-সম্পন্ন কতিপয় যুবক আপনারা একটি স্বতন্ত্র দল গঠিত করিয়া লইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ তাহাদিগের প্রতিভার উপযোগী ছিল না; সাহিত্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগে খ্যাতি-অর্জ্জন ও কীর্ত্তি-সংস্থাপন তাহাদের নিয়তি! তাহারা সাধারণ ছাত্রদল হইতে বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। জর্জ্জ সেই দলে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ঋষির আদর্শ সমুন্নত; কিন্তু অবস্থাবিচার না করিয়া সর্ব্বতোভাবে সেই আদর্শের অনুকরণ সংসারীর পক্ষে সকল সময় সুখের কারণ হয় না। এই ছাত্রদলের অনুকরণ জর্জ্জের পক্ষে সেইরূপ হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠে আর তাহার মন বসিল না! সে সাহিত্যচর্চ্চা করিতে লাগিল,—গদ্য ও পদ্য রচনায় তাহার ডেস্ক পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, কোনও মাসিকপত্র-সম্পাদকই তাহার স্বহস্তে ডাকবাক্সে প্রদত্ত সেই সকল অমূল্য রচনা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করিলেন না। আহত অভিমানে অনাদৃত কবি ও ঔপন্যাসিক সমালোচক হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। চার বৎসরে এই হইল।

এই সময়ের মধ্যে জর্জ্জ ছুটীতে কয়বার গৃহে গিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; সাহিত্য-চর্চ্চাশূন্য ও

সাহিত্যসঙ্গিবিবর্জ্জিত গৃহে তাহার আর পূর্ব্বের সে আকর্ষণ নাই। সে গৃহে আসিলে বিদ্যালয়ে ফিরিতে ব্যস্ত হইত। গৃহে তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির কোন উপকরণ নাই। তাহার জননী তাহার ভাবান্তর দেখিয়া ব্যথিতা হইতেন; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেন না।

জর্জ্জের এই পরিবর্ত্তনে আর এক জন অন্তরে বিষম বেদনা পাইত—সে হেলেন। হেলেনের প্রেম জর্জ্জকে বেষ্টন করিয়া সুখ-স্বর্গ রচনা করিয়াছিল। সে দেখিতে লাগিল, জর্জ্জ ক্রমেই পরি-বর্ত্তিত হইতেছে, তাহার আবেগ ক্রমে ঔদাস্যে পরিণত হইতেছে। সে অনাদর তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, জর্জ্জ সহরে বাস করে; সে গুণহীনা শৈশব-সহচরীকে বিস্মৃত হই-য়াছে। তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কি? দীপ্তদিবাকরদ্যুতির নিকট খদ্যোতের ক্ষীণ জ্যোতিঃ কে লক্ষ্য করে? কিন্তু হায়!—যাহারা গর্ব্বিরাগরক্ত গোলাপ পাইবে ও লইবে, তাহারা ভুলিয়া পত্রান্তরাল-বর্ত্তী কুন্দকলিকে আদর করে কেন? বিজন বনবাসে—পত্রচ্ছায়াই কুন্দকুসুমের উপযুক্ত আবাস। সে কি তাহা জানে না? কিন্তু কে তাহার আশা বাড়াইয়াছিল? হেলেন মনের দুঃখ মনেই রাখিত, প্রকাশ করিত না। কিন্তু কুসুমহৃদয়বদ্ধ কীট যেমন ফুলের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে, সেই মর্ম্মবেদনা তেমনই তাহার নবস্ফুট সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে লাগিল। তাহার নয়নে আর যৌবনচাঞ্চল্য নাই,—তাহাকে কাতরতা স্বপ্রকাশ। তাহার আননের অকাল-গাম্ভীর্য্য প্রফুল্লতাকে

দূর করিল—যেন অকালজলদোদয় কমলকুলানন্দ রবিকর নিবারণ করিল।

জর্জ্জ গৃহে আসিলে হেলেনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু সে হেলেনের কাতর মুখভাবে তাহার যাতনার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারিত না। সে তখন এমনই অন্ধ।

জর্জ্জ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া হেলেনকে বিবাহ করিবে, ইহাই জর্জ্জের পিতামাতার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, জর্জ্জ তাহার শৈশবসঙ্গিনীকে সত্যসত্যই ভালবাসে; কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলে সে আপনিই তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবে, তাঁহাদিগকে আর সে কথা বলিতে হইবে না।

৩

বলিয়াছি, অনাদৃত কবি ও ঔপন্যাসিক জর্জ্জ সমালোচক হইবার কল্পনা করিতেছিল। সে বাসনা কার্য্যে পরিণত হইল না। পঞ্চম বর্ষের প্রারম্ভেই তাহার পিতার মৃত্যু হইল। সংসারের ভার জর্জ্জের স্কন্ধে পড়িল। সাহিত্যসেবায় ব্যয় যথেষ্ট হইয়াছে, আয়ের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। কাযেই জর্জ্জকে অন্য চেষ্টা করিতে হইল। চাকরীর চেষ্টায় জর্জ্জ কর্ম্মকেন্দ্র রাজধানীতে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে আসিল।

নিদাঘে যখন দারুণ তাপে প্রকৃতি কাতরা হইয়া উঠে, তখন চাতকের কাতর আহ্বান সত্ত্বেও জলদ বিন্দু বর্ষণ করে না; কিন্তু বর্ষায় সেই নীরদই আপনি হৃদয়-রস-দানে ধরা প্লাবিত করিয়া দেয়।

ভাগ্য কখন কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাতও করেন না, আবার কখন স্বেচ্ছায় অপ্রত্যাশিত সাফল্য-সম্পদ দান করেন। এত দিনে ভাগ্য-দেবী জর্জ্জের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দুই তিন দিনের চেষ্টায় তাহার একটি চাকরী জুটিল। তাহার এক জন সতীর্থ সাহিত্যিকদলে না মিশিয়া সাধারণ ছাত্রদিগের দলে সাধারণ ছাত্রপাঠ্যে মনোযোগ দিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি গভর্মেণ্টের কোন কার্য্যালয়ে প্রধান সহকারীর কার্য্য করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় জর্জ্জের চাকরী হইল,—বেতনও নিতান্ত অল্প নহে। জর্জ্জের চাকরী হইবার দশ দিন পরে তাহার একখানি পত্র তাহার কলেজ ও বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়া তাহার হস্তগত হইল। 'নব মাসিক' পত্রে তাহার একটি গল্প গৃহীত হইয়াছে;—সম্পাদিকা কুমারী মেরী ব্রাউন তাহাকে এই সংবাদ জানাইয়াছেন, এবং তাহাকে, সম্ভব হইলে, আরও গল্প পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

পত্রপাঠ করিয়া জর্জ্জ আনন্দমত্ততায় বিহ্বল হইল। সে দুইবার তিনবার পত্রখানি পাঠ করিল। কি অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য,—কি আনন্দের সংবাদ! সৌভাগ্যের অরুণ কিরণের বিকাশ কি মধুময়! সে আবার পত্রখানি পাঠ করিল;—সম্পাদিকার হস্তাক্ষর স্পষ্ট, শোভন! পত্রের কথাগুলি সুসংবদ্ধ—যত্নরচিত। সে আবার পত্রখানি পাঠ করিল; তাহার পর পোর্টমেণ্ট খুলিয়া রচনার খাতাগুলি বাহির করিল।

প্রত্যেক গল্পের সহিত, প্রত্যেক কবিতার সহিত কত স্মৃতি

জড়িত! জর্জ্জ আবার সেগুলি পাঠ করিতে লাগিল। তাহার অজ্ঞাতে কখন দিনান্ত-তপন পশ্চিম মেঘে অন্তর্হিত হইতেছিল, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। অস্পষ্ট আলোকে আর অক্ষর দৃষ্টিগোচর হয় না। জর্জ্জ খাতা রাখিয়া উঠিল। আফিস হইতে ফিরিয়াই সে পত্র পাইয়াছিল; সে বেশপরিবর্ত্তনও করে নাই।

সন্ধ্যায় সে দীপ জ্বালিয়া আবার রচনার খাতা লইয়া বসিল; বাছিয়া বাছিয়া দুইটি গল্প ও দুইটি কবিতা নকল করিল। যখন সে কলম রাখিয়া উঠিল, তখন রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। সে দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া শয়ন করিল; দারুণ শ্রমের ও উত্তেজনার পর অল্পক্ষণেই প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

প্রভাতে যখন জর্জ্জের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বেলা আটটা। সে ঘড়ী দেখিয়া এক লম্ফে শয্যাত্যাগ করিল।

আফিসে যাইবার সময় জর্জ্জ পূর্ব্ব রাত্রিতে নকল করা গল্প ও কবিতা সঙ্গে লইয়া গেল।

৪

কোন অছিলায় আফিস হইতে একটু সকাল সকাল বিদায় লইয়া জর্জ্জ 'নব মাসিক' আফিসে যাত্রা করিল।

সে আফিসে সে শ্বেতশ্মশ্রু, বিরল-কেশ কার্য্যাধ্যক্ষের সমীপে নীত হইল। কার্য্যাধ্যক্ষ কি লিখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া চশমার মধ্য দিয়া তীব্র দৃষ্টিতে জর্জ্জকে দেখিয়া লইলেন। সে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় জর্জ্জের

বিকাশোন্মুখ গর্ব্বশতদল যেন শুকাইয়া উঠিল। কার্য্যাধ্যক্ষ জর্জ্জকে বসিতে বলিয়া তাহার প্রয়োজনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

জর্জ্জ তাহার প্রয়োজন বিবৃত করিল।

কার্য্যাধ্যক্ষকে সর্ব্বদাই নূতন লেখকদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, তিনি জর্জ্জের পাণ্ডুলিপি ও পত্র সম্পাদিকাকে পাঠাইয়া দিবেন।

সেই দিন জর্জ্জ জানিয়া আসিল, সম্পাদিকা কুমারী ব্রাউন বিচারক সার রবার্ট ব্রাউনের বিদুষী দুহিতা।

সাত দিন পরে জর্জ্জ সংবাদ পাইল, তাহার গল্প ও কবিতা গৃহীত হইয়াছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহার পর রাত্রি জাগিয়া গল্পের ও কবিতার রচনা জর্জ্জের নিত্যকর্ম্ম হইয়া উঠিল। সব রচনা 'নব মাসিক' কার্য্যালয়ে জমা হইতে লাগিল। সম্পাদিকার সহিত লেখকের পত্র-ব্যবহার ক্রমে আর বিরল রহিল না। এই ভাবে দুই মাস কাটিল।

তাহার পর 'নব মাসিকের' জন্মদিনের বার্ষিক উৎসবে জর্জ্জ নিমন্ত্রিত হইল। কার্য্যালয়ে স্থানাভাব; লেখকলেখিকাগণ সম্পাদিকার গৃহে সমবেত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সমাগমে, বহু লেখকলেখিকার মধ্যে—উজ্জ্বল পরিচ্ছদ ও সমুজ্জ্বল অলঙ্কারের সমাবেশক্ষেত্রে—উজ্জ্বল বিদ্যুদালোকে রত্নদীপ্তি ও দীপ্ত দৃষ্টির মধ্যে, জর্জ্জের সহিত কুমারী ব্রাউনের পরিচয় হইল।

সান্ধ্যসমিতি হইতে জর্জ্জ গৃহে ফিরিল। তাহার জীবন-নাটকে

নূতন অঙ্কের অভিনয় আরব্ধ হইল ;—আবার পরিবর্ত্তন সূচিত হইল। সমস্ত রাত্রি সে সুখস্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল ;—অতীত অন্ধকার—ভবিষ্যৎ সুখসমুজ্জ্বল—যশ, সম্মান, আর—প্রেম ! জগতে কিছুই অসম্ভব নহে। দ্বাবিংশবর্ষবয়স্কের সুখস্বপ্ন !

৫

'নব মাসিকে'র প্রতি জর্জ্জের অসাধারণ যত্ন হেতু সম্পাদিকার সহিত অল্প দিনেই তাহার কিছু ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। সে প্রথমতঃ দীর্ঘকাল নিষ্ফল চেষ্টার পর এই পত্রে যশের দ্বার মুক্ত দেখিয়া ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; ক্রমে সে আকর্ষণ পত্রকে ছাড়াইয়া সম্পাদিকাকেও স্পর্শ করিল। যৌবনকে বিশ্বাস করিতে নাই।

পূর্ব্বে কোনও বিদুষী রমণীর সহিত জর্জ্জের পরিচয় হয় নাই। কুমারী ব্রাউনের কথোপকথন ও ব্যবহার তাহার নিকট যেমন নূতন, তেমনই মধুর বোধ হইত। সে যেন স্বপ্নাবেশবিহ্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপ স্বপ্নে বর্ষাধিক কাল কাটিয়া গেল।

এই সময় জর্জ্জ একবার গৃহে গমন করিল। তাহার জননী তাহার চাকরীতে আহ্লাদিতা ও তাহার সাহিত্যিক সাফল্যে গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন। আর এক জন রমণী তাঁহার আহ্লাদের ও গর্ব্বের অংশ লইয়াছিল—সে হেলেন। জর্জ্জের বিধবা জননীর নিঃসঙ্গবাসে সেই তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার নিঃসঙ্গবাস-যাতনা দূর করিত। জর্জ্জের জননী পুত্রের আগমনপথ চাহিয়া ছিলেন,—আশা করিয়াছিলেন, উপার্জ্জনক্ষম পুত্র এইবার আসিলে তাঁহার আশা পূর্ণ

হইবে। এই সময়ের মধ্যে হেলেন তাঁহার কত আপনার, কত অত্যাবশ্যক হইয়াছে, তাহা দেখিলে, সে হেলেনকে তাঁহার দুহিতা করিবে। তেমন গুণবতী বধূ তিনি আর কোথায় পাইবেন?

জর্জ্জ গৃহে আসিল। সে জননীর প্রতি হেলেনের ব্যবহার লক্ষ্য করিল। কিন্তু তাহাতে সে আকৃষ্ট হইল না। তাহার জননী পুত্রের ভাব লক্ষ্য করিলেন; পুত্রকে উদাসীন দেখিয়া মনের কথা স্বয়ং পুত্রকে বলিলেন। জর্জ্জ সে কথা মনেই করে নাই। সে বিপদ গণিল;—আরও দিন কতক পরে,—পুনরায় ছুটীতে গৃহে আসিয়া সে সঙ্কল্প স্থির করিবে—জননীকে এইরূপ বুঝাইল। জননী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মাতৃহৃদয়ে বিষাদের ও সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

সরলা হেলেনের কথায় জর্জ্জের বিদুষী কুমারী ব্রাউনকে মনে পড়িল। উভয়ে কি প্রভেদ! সে সরল বাঁশের বাঁশীতে বীণার ঝঙ্কার পাইবে কিরূপে? হায়, সরল বাঁশের বাঁশী, তুমিও হৃদয়োত্থিত মধুর স্বরে মুগ্ধ করিতে পার সত্য, কিন্তু সে কেবল যখন কেহ তোমার হৃদয়ে হৃদয়াবেগ ঢালিয়া দেয়। তোমার হৃদয়তন্ত্রী মর্ম্মাবেগস্পর্শ ব্যতীত—সামান্য অঙ্গুলীকম্পনে কাঁপিয়া উঠে না। সকলে তোমার মূল্য বুঝে না।

জর্জ্জ কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেল।

৬

প্রণয়ে প্রথম পথ দ্রুত অতিক্রান্ত হয়। জর্জ্জের তাহাই হইয়াছিল।

কোন বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলে, যদি তাহাতে বাধা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তবে মানুষ যত সত্বর সম্ভব, তাহা শেষ করিতে চাহে। গৃহ হইতে ফিরিয়া জর্জ্জ কুমারী ব্রাউনকে পাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল। মন সঙ্কল্পের দাস; সঙ্কল্প যাহা দেখায়, মন তাহাই দেখে। তাই জর্জ্জের মন কুমারী ব্রাউনের ব্যবহারে তাহার প্রতি কুমারীর প্রেমের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে লাগিল। বিশেষতঃ পুংবৎপ্রগল্‌ভা বলিয়া কুমারী ব্রাউনের খ্যাতি ছিল। অন্য রমণী যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে সঙ্কুচিতা হয়েন, কুমারী ব্রাউন নিঃসঙ্কোচে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন। জর্জ্জের মন জর্জ্জকে বুঝাইল,—প্রেম যুবকযুবতীকে পরস্পরের সন্নিহিত করিতে চাহে, যুবককে যুবতীর লজ্জা ও যুবতীকে যুবকের সাহস প্রদান করে, এ সকল আলোচনা সেই প্রণয়-প্রদত্ত সাহসের ফল। জর্জ্জের আশা বাড়িয়া গেল।

জর্জ্জ কয় দিন চেষ্টার পর, অনেকগুলি কাগজ নষ্ট করিয়া কুমারী ব্রাউনকে আপনার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল। কবিজনোচিত উক্তিতে ও ভাষায় সে পত্র পূর্ণ। সে লিখিল, সে কুমারী ব্রাউনের অনুপযুক্ত, কিন্তু প্রেম-সূর্য্য শতদল-দলেও যেমন, তৃণ-কুসুমেও তেমনই কিরণ দান করে। তাঁহারই প্রেমের কিরণে তাহার এ প্রেমপ্রসূন প্রস্ফু-টিত হইয়াছে। তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন কি? সে বর্ষাধিককাল হৃদয়ে এই বাসনা লইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছে, বুঝিয়াছে, সে অযোগ্য হইলেও তিনি অপরের অপেক্ষা তাহাকে

অধিক অনুগ্রহ করেন। তাহাতেই সাহসী হইয়া সে এই প্রস্তাব করিল।

সে দিন কুমারী ব্রাউনের গৃহে সান্ধ্যসমিতিতে জর্জ্জের নিমন্ত্রণ ছিল। সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল। তাহার হৃদয় উদ্বেগকম্পিত, আশঙ্কায় তাহার মুখ পাণ্ডুর, তাহার নয়নে আশার উজ্জ্বল দীপ্তি।

৭

সন্ধ্যাসমিতিতে জর্জ্জের প্রতি কুমারী ব্রাউনের ব্যবহার যদি বিরক্তিব্যঞ্জক না হইয়া থাকে, সে কেবল ভদ্রতারক্ষার্থ। কারণ, শিক্ষিতা রমণীকে আর শিখাইতে হয় না যে, অতিথির প্রতি বিরক্তিপ্রকাশ ভদ্রতার নিয়মবিরুদ্ধ। জর্জ্জ তাঁহার ব্যবহার লক্ষ্য করিল। কিন্তু সহজে কেহ আশা ত্যাগ করে না। সে ভাবিল, ইহা লজ্জার বিকাশমাত্র।

গৃহে ফিরিয়া জর্জ্জ দেখিল, কুমারী ব্রাউনের পত্র আসিয়াছে। তাহার হৃদয় বেগে আঘাত করিতে লাগিল। সে খামখানি চুম্বন করিল। তাহার পর সযত্নে ধীরে ধীরে খুলিয়া পত্রখানি পাঠ করিল। পত্রখানি কুমারী ব্রাউনের বিশেষত্বব্যঞ্জক—পুরুষোচিত কঠোরতার পরিচায়ক। জর্জ্জের পত্রে তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়াছেন। পুরুষ ও মহিলায় পরিচয়কে যাহারা অনুরাগের নামান্তরমাত্র বিবেচনা করে, তাহারা সমাজের পক্ষে ত্যাজ্য। জর্জ্জ সামাজিক ও অন্যবিধ সমস্ত ব্যবধান অসাধারণ সাহসে অবহেলা করিয়াছে। কুমারী

ব্রাউনের অনুরাগ সম্বন্ধে তাহার ধারণা কবিজনোচিত হইতে পারে, কিন্তু সেই ধারণার বিষয় অবগত হইবার পর কুমারী ব্রাউন আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ বা পত্রব্যবহার করা সঙ্গত মনে করেন না।

জর্জ্জের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; আকাশকুসুম আকাশেই ঝরিয়া গেল। পত্রের প্রত্যেক কথা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে দরিদ্র,—সে হীন!

জর্জ্জ আবার পত্রখানি পাঠ করিবার চেষ্টা করিল—পারিল না। সে কি ভ্রান্ত!—সে কি ভ্রান্ত!

জর্জ্জ উন্মাদের মত কক্ষমধ্যে পরিক্রম করিতে লাগিল। সে যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। হৃদয়ে যন্ত্রণা যেন ক্রমেই তীব্রতর হইতে লাগিল। সহসা টেব্‌লের উপর একটা পাত্র তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কয় দিন পূর্ব্বে তাহার গ্রীবায় বেদনা অনুভূত হইলে চিকিৎসক এই ঔষধ লেপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঔষধ বিষ। জর্জ্জের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া যাইয়া পাত্র তুলিয়া লইল।

৮

চেতনাসঞ্চার হইলে জর্জ্জ দেখিল, মধ্যাহ্ন;—সে হাঁসপাতালে;—তাহার সতীর্থ—আফিসের সহকারী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন। একে একে সকল কথা তাহার মনে পড়িল।

তাহার সহপাঠী বন্ধু অপরাহ্ণে আবার আসিলেন। জর্জ্জের পকেটে তাঁহার একখানি পত্র পাইয়া হাঁসপাতালের কর্ম্মচারীরা প্রথমে

তাঁহাকেই সংবাদ দিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া জর্জ্জ তাঁহার নিকট সকল কথা বলিল। তিনি তিরস্কার করিলেন না, সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, বুঝাইলেন।

রাত্রিকালে জর্জ্জ বহুক্ষণ ভাবিল। তাহার গৃহ ও গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জননীকে মনে পড়িল। আর সঙ্গে সঙ্গে আজ হেলেনের বিষাদমলিন মুখচ্ছবি স্মৃতিপটে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে যে তাহারই পথ চাহিয়া আছে! অসার কাচের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া সে মহার্ঘ রত্ন হেলায় হারাইতে বসিয়াছিল। তুলনায় আজ সরলা হেলেনকে কত উন্নত, কত মধুর বোধ হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

৯

তাহার পর জর্জ্জের নামে আত্মহত্যার চেষ্টার জন্য নালিশ হইল। বিচারক—সার রবার্ট ব্রাউন। জর্জ্জের পক্ষে তাহার সেই বন্ধু মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতেছিলেন। তিনি কার্য্যালয়ে জর্জ্জকে এক পক্ষের অবকাশ দিলেন। সে মোকর্দ্দমার জন্য প্রস্তুত হইবে।

বন্ধু আশা করিয়াছিলেন, সার রবার্ট জর্জ্জকে চিনেন; অবস্থাবিবেচনায় তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। কন্যার সাহিত্যানুরাগের ফলে সার রবার্টকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইত; তাই তিনি সুযোগ পাইলেই সাহিত্যের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। জর্জ্জের পক্ষ-সমর্থক ব্যারিষ্টার কবিজনের মানসিক অবস্থা,—চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন-

শীলতা প্রভৃতি নানা কথা বলিলেন। উত্তরে সার রবার্ট বলিলেন, সাধারণ অপরাধী অপেক্ষা এইরূপ অপরাধীকে গুরুতর শাস্তিদান করা কর্ত্তব্য। ইহারা শিক্ষার অপব্যবহার করে; কেবল আপনারা নষ্ট হইয়াই নিরস্ত হয় না, পরন্তু সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা বালিকাদিগকে দেবীত্বে সমাসীনা করিয়া সংসারের অনুপযোগিনী করে। তিনি জর্জ্জের তিন শত টাকা অর্থদণ্ড করিলেন। জর্জ্জের বন্ধু আদালতে উপস্থিত ছিলেন; তিনি জরিমানার টাকা দিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপনার গৃহে লইয়া যাইলেন।

বন্ধুগৃহে কিছুক্ষণ কাটাইয়া জর্জ্জ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার আর কয় দিন ছুটী আছে?"

বন্ধু বলিলেন, "আর সাত দিন। কেন?"

"আমি বাড়ী যাইব।"

জর্জ্জ বন্ধুগৃহ হইতে আপনার বাসায় আসিল।

বাসায় আসিয়া জর্জ্জ দেখিল, 'নব মাসিক'-কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারী কুমারী ব্রাউনের পত্র লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। প্রথমে পত্রখানি লইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। শেষে সে পত্রখানি লইল। কক্ষমধ্যে যাইয়া সে দীপালোকে পত্রখানি পাঠ করিল। কুমারী ব্রাউন তাহার দণ্ডের কথা শুনিয়াছেন। সে তাহার অবিবেচনার ফলে কষ্ট পাইয়াছে, সে জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন; এবং 'নব মাসিকে'র সম্পাদিকারূপে 'নব মাসিকে'র লেখকের সাহায্যার্থ তিন শত টাকা পাঠাইয়াছেন।

জর্জ্জ পত্র ও নোট কয়খানি হর্ম্ম্যতলে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সে ভাবিতে লাগিল। কি উপহাস! তাহার অবস্থায়, সামাজিক সম্মানে, ক্ষমতায় কি বিদ্রূপ! কি দুরাশায় চালিত হইয়া সে এই গর্ব্বিতায় মানসকল্পিতা দেবীকে দেখিয়াছিল? সে মধ্যবিত্তের গৌরব বিস্মৃত হইয়াছিল,—সে তাহার ফল পাইয়াছে। তখন আবার হেলেনকে মনে পড়িল। প্রাণিবাসহীন, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গের গর্ব্বোদ্ধত কঠোরতার তুলনায় শ্যামশোভাসম্পন্ন, নির্ঝরকলনাদমুখরিত, তরুমর্ম্মরধ্বনিত, জীবকুলাশ্রয় প্রান্তরের শোভা কত মধুর!

জর্জ্জ উঠিল। পত্র না লিখিয়া একখানি খামে কুমারী ব্রাউনের প্রেরিত নোট কয়খানি পূরিয়া তাঁহার লোকের নিকট প্রত্যর্পণ করিল। সে এ পর্য্যন্ত কুমারী ব্রাউনের নিকট যত পত্র পাইয়াছিল, সে সব একটি সুদৃশ্য বাক্সে বদ্ধ ছিল। সেগুলি বাহির করিয়া সে সব পত্রগুলি ভস্মীভূত করিল। তাহার পর ব্যাগ লইয়া সে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

দুই ভাই।

১

সঙ্কীর্ণ গলির উপর ক্ষুদ্র গৃহ; তাহারই দ্বিতলস্থ একটি মধ্যায়তন কক্ষে এক জন রমণী মৃত্যু-শয্যায় শয়ানা। বার্দ্ধক্যের কঠোর কর-স্পর্শ এখনও রমণীর বিগতপ্রায়যৌবনলাবণ্য আননে একটি রেখাও অঙ্কিত করিতে পারে নাই; রোগক্লেশ এখনও সে পাণ্ডুর আননের শেষ রূপচিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। বিংশতিবর্ষীয় পুত্র বিপিন শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জননীর পাণ্ডুর মুখ পানে চাহিয়া আছে।

অস্তগমনোন্মুখ তপনের লোহিতাভ করজাল পশ্চিমের মুক্ত বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া শয্যার পাদদেশে আসিয়া পড়িল। একটি ক্ষুদ্র বিহগ বাতায়নপার্শ্বে বসিয়া একবার মধুর কূজন করিল, তাহার পর উড়িয়া গেল—বুঝি সে ভাবিল,এ মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে তাহার আনন্দ-গীতি শোভন হইবে না। মরণাহতা জননী ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "বিপিন, একবার নলিনকে আর শেফালিকাকে ডাক।"

বিপিন দুই জনকে ডাকিল। আহ্বান শুনিয়া পার্শ্বের কক্ষ হইতে একটি মলিনবর্ণ দশমবর্ষীয় বালক ও একটি কনকচম্পকদাম-গৌরী পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; যেন রজনী

ও ঊষা একত্র আসিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া উভয়েরই চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে। নলিন রমণীর পুত্র। শেফালিকা তাঁহার কোন আত্মীয়ার কন্যা, শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা। রমণীর স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার পত্নী বিচার বা বিবেচনার অপেক্ষা না করিয়া স্বামীর ধর্ম্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, স্বামীকে ছাড়িয়া স্ত্রীর কোনও ধর্ম্ম নাই।

দুর্ব্বল হস্তে বালকের ও বালিকার হস্ত ধরিয়া রমণী যুবকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। যুবক এতক্ষণ কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়াছিল—এবার কাঁদিয়া ফেলিল। আপনার হস্তে তপ্ত অশ্রুর স্পর্শানুভবমাত্র রমণী বলিলেন, "ছিঃ! বাবা বিপিন, তুই অমন অধীর হইলে উহাদের কে দেখিবে? তোর পিতার মৃত্যুর পর হইতে এতদিন তোদের মানুষ করিয়াছি; সংসারে দুঃখকষ্ট এক দিনের জন্য তোদের জানিতে দিই নাই; ভাবিতাম—তোরা ছেলেমানুষ, তোদের কোন কষ্ট সহিবে না। আজ তুই বড় হইয়াছিস, আজ ইহাদিগের ভার তোর হাতে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতেছি—আমি ত সুখেই মরিতেছি! আমার জন্য কান্না কেন বাবা? ইহাদের সকল ভার তোর উপর রহিল।"

জননী পুত্রকে কাঁদিতে বারণ করিলেন বটে, কিন্তু অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

সেই দিন নিশাশেষে রমণীর ক্ষীণজ্যোতিঃ জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

বিপিন ভাবিল—মা যখন নলিনের ও শেফালিকার ভার আমার উপর দিয়া গিয়াছেন, তখন আমি সাধ্যমতে তাহাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে চেষ্টার ক্রটী করিব না।

২

যে দিন বিপিনের হস্তে নলিনের ও শেফালিকার ভার অর্পণ করিয়া রমণী জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার পর দশ বৎসর বহিয়া গিয়াছে! অনন্ত কালের তুলনায় দশটি বৎসর সমুদ্রসৈকতে এক কণা বালুকামাত্র; কিন্তু এই দশ বৎসর কালে সেই যুবকের ও সেই বালকবালিকার কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! বিপিন এখন যৌবনের শেষ সীমায় উপনীত। জানি না, কি গোপন বাসনায়, কি দারুণ চিন্তায়, কি কঠোর মঃনকষ্টে, তাহার উৎফুল্ল-যৌবন-শ্রীসম্পন্ন আননে অকালবার্দ্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে। যৌবনের উৎসাহ বা উদ্যম, আকুলতা বা আবেগ, তাহার কিছুই নাই! জগতে কে অপরের হৃদয়ের গোপনীয় বেদনা জানিতে পারে? নলিন এখন আর বালক নহে, প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। শেফালিকাও এখন আর সে বালিকা নাই—যৌবনের ঐন্দ্রজালিক করস্পর্শে তাহার দেহে মলয়পবনস্পর্শে কাননে বিকশিত কুসুমের শোভার মত অসামান্য রূপরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। চাঞ্চল্য এখন গাম্ভীর্য্যে নিমগ্ন হইয়াছে! নলিন এখন এক বড় বণিকের হৌসে 'ক্যাসিয়ার' অর্থাৎ খাজাঞ্চি।

আজ বৈশাখের সন্ধ্যায় আপনার কক্ষে বসিয়া বিপিন কি

ভাবিতেছে। সম্মুখে টেব্‌লে কয়খানা পুস্তক ছড়ান রহিয়াছে; একটা বড় ল্যাম্প কক্ষে উজ্জল আলোক বিস্তার করিতেছে। রাজ-পথে কোন পথিকের উচ্চহাস্য বা কোন শকটের গমনশব্দ শ্রুত হইতেছে; কিন্তু সে সকলে বিপিনের মনোযোগ ছিল না, সে তদ্গদচিত্তে কি ভাবিতেছিল।

কিছুক্ষণ ভাবনার পর বিপিন আপনা-আপনি বলিল, "আর বিলম্ব করি কেন? নলিনের ভার মা আমার হাতে দিয়া গিয়া-ছিলেন। যতদিন সে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল, ততদিন আপনার সুখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তাহার সুখবিধানে চেষ্টিত হইয়াছি। আজ আর সে বালক নহে। এখন সে বড় হইয়াছে,—যে গচ্ছিত ধনের চিন্তায় এতদিন ব্যস্ত ছিলাম, সে চিন্তার কারণ এখন আর নাই। তবে আর কেন আপনার সুখের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকি? জগতে সুখলাভের চেষ্টা সকলেই করিয়া থাকে; আমি কেন করিব না? আজ নলিনকে এ কথা বলিব।"

বিপিন এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় কক্ষদ্বার হইতে কে ডাকিল, "দাদা!"

বিপিন বলিল, "কে, নলিন? আইস, ভাই, ভিতরে আইস।"

নলিন কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল; বসিয়া বলিল, "দাদা একটা আবশ্যক কথা বলিতে আসিয়াছি।"

বিপিন বলিল, "আমিও তোমাকে একটা দরকারী কথা বলিব। তুমি কি বলিবে, বল।"

নলিন বলিল, "আমি শেফালিকাকে বিবাহ করিব।" :

বিপিন চমকিয়া উঠিল। তাহার নয়নদ্বয় যেন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সে আত্মসংবরণ করিল। নতদৃষ্টি নলিন তাহার মুখের বেদনাব্যঞ্জক ভাব লক্ষ্য করিতে পারিল না। আত্মসংবরণ করিয়া বিপিন বলিল, "আচ্ছা।"

কিছু ক্ষণ দুই জনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বিপিন বলিল, "তুমি শেফালিকার মত লইয়াছ?"

নলিন বলিল, "হাঁ।"

তাহার পর দুই জনে আবার চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নলিন উঠিয়া যাইতেছিল, দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দাদা, তুমি কি বলিবে বলিতেছিলে?"

বিপিন বলিল, "আজ থাক্। আর এক দিন বলিব।"

নলিন আনন্দোৎফুল্লহৃদয়ে এ বিবাহে দাদার সম্মতি-সংবাদ শেফালিকাকে বলিতে গেল।

৬

নলিন চলিয়া গেলে বিপিন উঠিয়া কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার পর চেয়ারে বসিয়া দুই করে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দন কি যাতনাময়,—কি মনোবেদনাব্যঞ্জক, তাহা কে বলিবে? মর্ম্মব্যথাপীড়িত হৃদয় হইতে অব্যক্ত বেদনা বহিয়া সে অশ্রুরাশি নয়নে ফুটিতে লাগিল।

কিছু ক্ষণ কাঁদিয়া বিপিন ভাবিতে লাগিল, এত দিন আপ-

নার সকল সুখ তুচ্ছ করিয়া যাহার সুখবিধানে চেষ্টিত হইয়াছি, আজ কি আত্মসুখাশায় তাহাকে চিরজীবনের জন্য অসুখী করিব? মৃত্যু-শয্যায় মা আমার হাতে নলিনকে ও শেফালিকাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আজ আমি আপনার সুখের জন্য তাহাদিগকে অসুখী করিব? জীবন কুসুমের মত ক্ষণস্থায়ী—তাহা প্রভাতে ফুটিয়াছে, সন্ধ্যায় শুকাইয়া যাইবে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য কেন তাহাদের সুখ নষ্ট করিব? আমি তাহাদের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইবার আশা করি, তাহাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করাই আমার কর্ত্তব্য। নলিন শেফালিকাকে বিবাহ করিয়া সুখী হউক—আমি তাহার সুখের অন্তরায় হইব না। মা আমার আমাদের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, আর আমি তাঁহার কথায়, একটা সুখ-আশা বিসর্জ্জন করিতে পারিব না? নলিনের ভার আমার উপর; তাহার সুখের সুখের জন্য, যত কষ্ট সহ্য করিতে হয়, করিব।

বিপিন চক্ষু মুছিয়া স্থির হইল। হৃদয়ে কোন মহৎ সঙ্কল্প উপস্থিত হইলে বলের অভাব হয় না; তখন বল আপনি আইসে। সঙ্কল্প স্থির হইলে বিপিনের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা তপনোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত অপসৃত হইয়া গেল।

বিপিন আপনি উদ্যোগ করিয়া শেফালিকার সহিত নলিনের বিবাহ দিল; কিন্তু হৃদয়ের কোন্ নিভৃত প্রান্তে কোথায় যে কেমন একটু বেদনা তীক্ষ্ণ কুশাঙ্কুরের মত বিদ্ধ হইতেছিল, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে পারিল না।

৪

দিন যেমন যায়, তেমনই যাইতে লাগিল। বিবাহের পর প্রথম দিন কতক নলিনের মনে যে অপরিমিত আনন্দোচ্ছ্বাস আসিয়াছিল, বন্যার জলের মত তাহা শীঘ্রই সরিয়া গেল। তখন দাম্পত্য জীবনের দৈনন্দিন মান, অভিমান, আদর, সোহাগ, ভ্রূকুটী, চুম্বন, যেমন হইয়া থাকে, তেমনই হইতে লাগিল। আনন্দের প্রথম প্লাবন দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। তবুও যেন নলিনের ও শেফালিকার হৃদয়ে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটু পরিবর্ত্তন আসিল,—সেটা একান্তই স্বাভাবিক ; কেন না, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একাংশ ত্যাগ করিয়া আর এক অংশে প্রবেশ করিতে হয় ;—দুই অংশে প্রভেদ প্রভূত। বিবাহিতজীবনে একটা দায়িত্ববোধ, একটা গাম্ভীর্য্য আইসে, যাহা অবিবাহিত জীবনে আসিতে পারে না।

বিপিনের পূর্ব্বে যেমন দিন কাটিতেছিল, এখনও তেমনই কাটিতে লাগিল। কেবল তাহার দেহে অকালবার্দ্ধক্যের চিহ্নসকল ক্রমেই পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতে লাগিল,—উন্নত কপালে চিন্তারেখা দৃষ্ট হইল, কেশজাল শ্বেত হইয়া উঠিল, মনের স্ফূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। নলিন এক এক দিন জিজ্ঞাসা করিত, "দাদা, তোমার কি কোন অসুখ হই-য়াছে ?" বিপিন বলিত, "না।" নলিন বলিত, "তবে দিন দিন এমন হইয়া যাইতেছ কেন ?" বিপিন হাসিয়া বলিত, "ও কিছুই নহে। আমি মরিবার পূর্ব্বে তুই জানিতে পারবি, সে জন্য অত ভাবিয়া কায নাই।"

শেষ নলিন জেদ করিয়া দাদাকে দেশভ্রমণে সম্মত করিল।

আপনি সঙ্গে যাইয়া টিকিট করিয়া, সে দাদাকে কলম্বো-যাত্রী ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া আসিল। সেই দিন গৃহে ফিরিয়া নলিন শেফালিকাকে বলিল, "দাদার নিশ্চয়ই কোন অসুখ করিয়াছে; কিন্তু তিনি যে তাঁহার অসুখের কথা, কি অন্য কোনও কথা আমার কাছে গোপন করেন, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। সে কথা ভাবিলে আমার বড় কষ্ট হয়।" বলিতে বলিতে নলিনের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। শেফালিকা বলিল, "এখন তিনি সারিলেই ভাল। তিনি নিশ্চয়ই সারিয়া আসিবেন।"

৫

নিয়মিত সময়ে বিপিন গৃহে ফিরিয়া আসিল; কিন্তু এই ভ্রমণে তাহার দেহের বা মনের কোনপ্রকার উন্নতিই পরিলক্ষিত হইল না।

গৃহে আসিয়া বিপিনের যেন আরও কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইত। ইতঃপূর্ব্বে অভ্যাসহেতু দৈনন্দিন জীবনে তত অভাব অনুভূত হইত না—এবার সে অভ্যাস পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, তাই অভাব তীব্র বলিয়া বোধ হইত। দেশভ্রমণে বিপিনের বরং এই অপকারই হইয়াছিল;—উপকার কিছুমাত্র হয় নাই। যে যাতনা জুড়াইবার নহে, তাহা কি দেশভ্রমণে জুড়ায়? কল্পনা যে ক্ষুদ্র যাতনাকে বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলে, সে যাতনা অভিনব দৃশ্যের মধ্যে গেলে দূর হইতে পারে সত্য; কিন্তু প্রাণের প্রকৃত যাতনা কিছুতেই জুড়ায় না—হৃদয়ের ক্ষত কিছুতেই মিলায় না।

গৃহে নিতান্তই 'ফাঁকা ফাঁকা' বোধ হয় দেখিয়া, বিপিন একদিন

নলিনকে বলিল, "নলিন, তোর আফিসের কায আমাকে শিখাইতে পারিস্?" নলিন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" বিপিন উত্তর দিল, "কখন কি আবশ্যক হয় কে জানে,—শিখিয়া রাখায় হানি কি?" নলিন বলিল, "তাহা কিছুতেই হইবে না; যত দিন আমি উপার্জ্জন করিতে পারিব, তত দিন কিছুতেই তোমাকে চাকরী করিতে দিব না।" বিপিন হাসিয়া বলিল, "পাগল, আমি কি এখনই চাকরী করিতে যাইতেছি? বাড়ীতে কোনও কায নাই,—বড় একা একা বোধ হয়, তাই তোর আফিসে যাইয়া বসিব।"

নলিন দাদাকে আফিসে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। বিপিন আফিসের অন্যান্য কর্ম্মচারীরই মত প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে আফিসে যাইত; আর নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে গৃহে ফিরিত না। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ উপস্থিত হইল। আফিসের কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কেহ যে আফিসের আয়ব্যয়ের হিসাবাদি দেখিয়া যাইবে, ইহা কর্ত্তাদের অভিপ্রেত ছিল না। কাযেই ভ্রাতাকে খাতাপত্রে হাত দিতে দেওয়ার জন্য নলিন তিরস্কৃত হইল। সে কথা শুনিয়া বিপিন পরদিবস হইতে আফিসে যাওয়া রহিত করিল।

এ কয় দিন আফিসে যাইবার অভ্যাসের পর বিপিন দেখিল—গৃহের বিজনতা নিতান্তই অসহনীয়। বিপিন নলিনকে কিছু না বলিয়া একটা চাকরী যোগাড় করিল; কিন্তু সে সন্ধান পাইয়া শেফালিকা ও নলিন এত দুঃখ করিল ও এমন প্রতিবাদ করিল যে, স্নেহশীল বিপিনের আর চাকরী করা হইল না। নলিন বলিল,

"দাদা তুমি আমার গৃহের দেবদূত—যে গৃহদেবতাকে পরিশ্রম করায়, তাহার মঙ্গল নাই। আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তুমি কিছুতেই চাকরী করিতে পাইবে না।" শেফালিকা বলিল, "কি দুঃখে তুমি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে যাইবে? তোমার কিসের অভাব? তোমরা এক জনও বাড়ী থাকিবে না,—আর আমি কি একা এই বাড়ীতে থাকিতে পারি? তুমি কিছুতেই চাকরী করিতে পাইবে না।"

নলিনের ও শেফালিকার স্নেহ দেখিয়া বিপিনের চক্ষুতে জল আসিল। বিপিনের আর চাকরী করা হইল না।

বিপিন উপন্যাস পাঠ করিয়া হৃদয়ের যাতনা ভুলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু গম্ভীরপ্রকৃতি বেদনাক্লিষ্ট বিপিনের উপন্যাস ভালই লাগিত না। কিছুতেই কিছু ভাল লাগে না দেখিয়া, বিপিন শেষে দর্শন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মনের অবস্থা ভাল না থাকিলে কিছুই ভাল লাগে না। অল্পদিনের মধ্যেই বিপিন আবার অধ্যয়ন ছাড়িয়া দিল। নিতান্ত মর্ম্মব্যথায় প্রপীড়িত হইলে বিপিন কেবল এক একবার সেই ভক্তিভরা গানটি স্মরণ করিত,—

"থাক, নাথ, থাক মোর সাথে সাথে অনুক্ষণ।
আসিছে সন্ধ্যার ছায়া বিস্তারি করাল কায়া,
ছিল যা'রা, তেয়াগিয়া করিয়াছে পলায়ন;
সুখ-আশা রাশি রাশি সকলি যেতেছে ভাসি'
অনাথের নাথ, তুমি কাছে থেক অনুক্ষণ।"

এমনই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল।

৬

ইহার পর বিপিনের আর বড় অধিক দিন কর্ম্মের অভাব রহিল না। শেফালিকার যখন একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হইল, তখন বিপিনের নিকট যেন এক নূতন জগতের দ্বার মুক্ত হইল। বিপিনের হৃদয়ের ঘনান্ধকারের মধ্যে সেই শিশু যেন ভাস্বর শুকতারার মত ফুটিয়া উঠিল। শিশু বুঝি আপনার সঙ্গে স্বর্গের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লইয়া আসে, তাই এই চিরদুঃখময় জগতেও সে সকলের হৃদয়ে আনন্দ দান করিয়া থাকে। শিশুর ক্ষুদ্র দুইখানি বাহুর বন্ধনের নিকট জগতের আর সকল বন্ধন হীনবল বলিয়া বোধ হয়;—শিশুর অধরে অমল হাসির সম্মুখে জগতের কত কর্ত্তব্য ভাসিয়া যায়;—হৃদয়ের কঠোর বৈরাগ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

নলিনের পুত্র বিপিনের হৃদয়ে নূতন আনন্দ দান করিল। সেই শিশুকে লইয়া বিপিনের সময় কাটিত। শিশুও বিপিনকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, বিপিনও শিশুকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। প্রৌঢ় জ্যেষ্ঠতাত ও শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে মনের মিলের যে কি কারণ ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। তবে এক জনকে ছাড়িয়া থাকিতে অপরের কষ্ট হইত। কার্য্যবশতঃ কোথাও যাইলে গৃহে ফিরিয়া যতক্ষণ শিশুকে দেখিতে না পাইত, ততক্ষণ বিপিন সুস্থির হইতে পারিত না; শিশুও কিছুক্ষণ জ্যেষ্ঠতাতকে দেখিতে না পাইলে কাঁদিয়া বাড়ীর সকলকে বিরক্ত করিয়া তুলিত।

দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, ভালবাসা

বিরক্তি লইয়া, দেখিতে দেখিতে দুইটি বৎসর চলিয়া গেল। নলিনের পুত্র সুকুমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জ্যেঠামহাশয়ের সমগ্র হৃদয়খানি অধিকার করিয়া লইল।

৭

পৌষের অপরাহ্ণ। ধূমাচ্ছন্ন পশ্চিম গগনে স্বভাবতঃ অনুজ্জ্বল-কর শীতের তপন হেলিয়া পড়িয়াছে—তাহার ম্লানকর প্রভায় গৃহ-চূড়া সকল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার কক্ষে বাতায়নসম্মুখে বসিয়া বিপিন পথের দিকে চাহিয়া আছে; আর তাহার নিকট দাঁড়াইয়া নলিনের দুইবৎসরবয়স্ক পুত্র সুকুমার অর্দ্ধস্ফুট কথায় কত-কি বলিয়া যাইতেছে। বিপিনের গৃহের সম্মুখে একটা ছাত্রাবাস হইতে কৃষ্ণ, ধূসর, লোহিতাভকৃষ্ণ প্রভৃতি নানাবর্ণের গরম কোট পরিধান করিয়া এক দল ছাত্র বেড়াইতে বাহির হইল। তাহাদিগের যুবকজনসুলভ উচ্চহাস্যে সে গলি শব্দমুখর হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে এক জন পকেট হইতে একটা চুরুট বাহির করিতে না করিতে পাঁচ সাত জনে সেটা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে আরম্ভ করিল,—ফলে সেটা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তখন সকলেই একবারে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল—এ একটা ভারি মজা।

বিপিন যুবকদিগের কার্য্য লক্ষ্য করিতেছে, এমন সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে নলিন দ্রুতবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল;

বিকৃতকণ্ঠে নলিন ডাকিল, "দাদা!"

বিপিন চমকিয়া উঠিল,—বলিল, "কি ভাই?"

নলিন বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আফিসের হিসাবপত্র আমার হাতে থাকে। আমি মধ্যে মধ্যে চেক জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করিয়া লইতাম। সেই টাকা আমি 'স্পেকুলে-শনে' ব্যয় করিতাম। কোনটায় জিতিয়াছি, কোনটায় হারিয়াছি। মোটের উপর হিসাব মত টাকা আবার ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিতাম। এবার আমি যাহাতে টাকা দিয়াছি, তাহাতেই হারিয়াছি। জিতিবার আশায় ক্রমাগতই টাকা বাহির করিয়াছি; কিন্তু একবারও জিতিতে পারি নাই।"

নলিন একটু চুপ করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আফিসের কর্ত্তারা এবার সব জানিতে পারিয়াছেন। এখনই আমাকে ধরিতে আসিবে।"

ভ্রাতার কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিপিন যেন বজ্রাহতের মত হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "কত টাকা লইয়াছ?"

নলিন উত্তর করিল, "ত্রিশ হাজার।"

বিপিন বলিল, "এত টাকা তোমারও নাই, আমারও নাই।—এখন উপায়?"

নলিনের দৃষ্টি তাহার শিশুর উপর পড়িল। বেদনা-ব্যথিত স্বরে সে বলিল, "তবে কি আমার উদ্ধারের কোনও উপায় নাই?"

সংসার-সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহার ভাগ্যে এখনও সুধা ভিন্ন গরল উঠে নাই, সে কি সহজে সংসার ত্যাগ করিতে চাহে?

সহসা বিপিনের মনে হইল, সে নলিনকে লিখিতে শিখাইয়াছিল

—উভয়ের হস্তাক্ষর একরূপ। সে একটা কি স্থির করিল। তাহার পর সে নলিনকে বলিল, "আমি তোমাকে উদ্ধার করিব; কিন্তু শপথ কর—আমি যাহা বলিব, তাহাই করিবে?"

অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথে বাত্যাবিতাড়িত বারিধিবক্ষে ভগ্নপোত নাবিক সহসা তরঙ্গে তীরে উপনীত হইলে যেমন আনন্দিত হয়, নলিন তেমনই আনন্দিত হইল। সে বলিল, "তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।"

বিপিন বলিল, "তবে আমাকে ছুঁইয়া শপথ কর,—আমি যাহা করিব, তুমি তাহার প্রতিবাদ করিবে না। বল,—আমি যাহা বলিব, তুমি তাহাই স্বীকার করিবে।"

নলিন স্বীকৃত হইল।

সেই সময় সোপানশ্রেণীতে দ্রুত পদশব্দ শ্রুত হইল। নলিন বলিল, "ওই তাহারা আসিতেছে। আমি কি গৃহের পশ্চাতের দ্বার-পথে পলাইব?"

বিপিন বলিল, "তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। চুপ করিয়া বসিয়া থাক। যাহা করিতে হয়, আমি করিব।"

পরমুহূর্ত্তেই পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টার ও আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

৮

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী নলিনকে দেখাইয়া পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টারকে বলিলেন, "এই ব্যক্তিই অপরাধী।"

ইন্‌স্‌পেক্টার নলিনকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন। বিপিন বলিল, "কি অপরাধে উহাকে গ্রেপ্তার করিতেছেন?"

আফিসের কর্ম্মচারী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ও আমাদের আফিস হইতে ত্রিশ হাজার টাকা চুরী করিয়াছে।"

স্থিরভাবে বিপিন বলিল, "চুরী ও করে নাই—আমি করিয়াছি।"

শুনিয়া সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

বিপিন বলিতে লাগিল, "আপনি জানেন, আমি দিনকতক আপনার আফিসে যাইতাম। সে জন্য আপনি নলিনকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। সেই সময় আমি আফিসের সব দেখিয়া আসি। আমি চেক জাল করিয়া চুরী করিয়াছি। নলিন নির্দ্দোষ।"

আফিসের কর্ম্মচারী বলিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম—তোমার ভ্রাতা এত দিন কায করিয়া এখন সহসা এ দুষ্কর্ম্ম করিল কেন? তুমি নিজমুখে দোষ স্বীকার করিতেছ? জান, আমি অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট?"

স্থিরস্বরে বিপিন বলিল, "আমি দোষী।"

ইন্‌স্পেক্টার বিপিনকে গ্রেপ্তার করিলেন। বিপিন তাঁহার নিকট হইতে দুই মিনিট সময় লইয়া একখানা পত্র লিখিল—লিখিয়া সে পত্রখানা নলিনকে দিয়া বলিল, "আমি চলিয়া যাইলে এই পত্রখানা পড়িয়া দেখিও। পড়িলে সব বুঝিতে পারিবে।"

তাহার পর আফিসের কর্ম্মচারী ও ইন্‌স্পেক্টারের সঙ্গে বিপিন

থানায় চলিয়া গেল। যে স্থানে সুকুমার দাঁড়াইয়াছিল, সে আর সে দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

বিপিন যাইতে না যাইতে নলিন তাহার পত্রখানি খুলিয়া পড়িল, —"ভাই নলিন,

"যে দিন তুমি আমার নিকট শেফালিকাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে—সে দিন আমি তোমাকে একটা আবশ্যক কথা বলিতে যাইতেছিলাম। আমি শেফালিকাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা তোমাকে জানাইব, ভাবিতেছিলাম। তুমি প্রস্তাব করিলে আমি ভাবিলাম—মা মরিবার সময় তোমাকে আমার হাতে দিয়া গিয়াছিলেন, আমি তোমার সুখের অন্তরায় হইব না।

"সে দিন মার কথা স্মরণ করিয়া তোমার বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলাম। আর আজ শেফালিকার কথা ভাবিয়া তোমাকে বাঁচাইলাম। আমি জানি, তুমি দণ্ড পাইলে শেফালিকার সকল সুখ নষ্ট হইবে।

"এ কথা শেফালিকাকে বলিও না। শুনিলে সে কষ্ট পাইবে। তদ্ভিন্ন এ কথা শুনিলে যদি তোমার প্রতি তাহার শ্রদ্ধাভক্তি দূর হইয়া যায়, তবে তোমাদের উভয়েরই জীবন নরকযন্ত্রণাময় হইয়া উঠিবে। তাই আমার শেষ অনুরোধ,—শেফালিকা যেন এ কথা জানিতে না পায়। সে আমাকেই দোষী বলিয়া জানুক।

"এক জনকে ছাড়িয়া যাইতে আমার কষ্ট হইতেছে—সে সুকুমার।

আমার হইয়া তাহাকে একটি স্নেহ-চুম্বন দিও। শিশু সহজেই আমাকে ভুলিয়া যাইবে।

"তোমার চিরশুভার্থী ভ্রাতা বিপিন।"

পত্র পাঠ করিয়া নলিন স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

সহসা শিশুর ক্রন্দনে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সুকুমার তখন 'জ্যেঠার কাছে যাবো' বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সংযম।

১

অনতিদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে কুঞ্জবিহারী যাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে চাহেন নাই, এবং ঐশ্বর্য্যশালী স্বামিরূপে তিনি যাঁহাকে জগতের সকল রত্নের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান মনে করিতেন, মৃত্যু আসিয়া সহসা তাঁহাকে লইয়া গেল; বিপত্নীক কুঞ্জবিহারী শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রবল ঝটিকায় তরুশাখার আঘাতে সহচরের প্রাণনাশ হইলে অবশিষ্ট বিহগ যেমন আপনার শাবকগুলিকে দ্বিগুণ যত্নে বক্ষের তাপে বর্দ্ধিত করে, তিনি তেমনই যত্নে আপনার সন্তানদ্বয়কে পালন করিতে লাগিলেন। সভা, সমিতি, বন্ধু ও বান্ধব সব ত্যাগ করিয়া কুঞ্জবিহারী একাধারে কন্যাদ্বয়ের পিতামাতার কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহাদের লইয়াই তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবন নূতন-লক্ষ্যাভিমুখগামী হইল।

ক্রমে নির্ম্মলা ও অমলা বিবাহযোগ্যবয়ঃপ্রাপ্তা হইল। তখন কুঞ্জবিহারী তাহাদের বিবাহ বিষয়ে সচেষ্ট হইলেন। কুঞ্জবিহারীর বিপুল সম্পত্তির লোভে অনেক পুত্রের পিতা তাঁহার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে ব্যগ্র হইলেন। কুঞ্জবিহারী অনেক বাছিয়া,

অনেক বিবেচনা করিয়া, শেষে একটি পিতৃমাতৃহীন, বিনয়ী, বিদ্যানুরাগী পাত্রে জ্যেষ্ঠা কন্যা নির্ম্মলাকে সমর্পণ করিলেন। কেহ কেহ জামাতাকে গৃহে রাখিবার কথা বলিলেন ;—কুঞ্জবিহারী সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না।

দুই বৎসর পরে কুঞ্জবিহারী অমলার বিবাহ দিলেন। দ্বিতীয় জামাতা ধনীর সন্তান।

তাহার পর কুঞ্জবিহারী সংসার সম্বন্ধে স্বীয় কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে বুঝিয়া, সংসারের হাটে দোকানপাট বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিলেন। আপনার বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকাংশ তিনি নানা সদনুষ্ঠানে দান করিলেন। অবশিষ্ট অর্থের অল্পমাত্র নিজের জন্য রাখিয়া তিনি আর সব কন্যাদ্বয়কে দিলেন। তার পর, জ্যেষ্ঠা কন্যাকে গুণবান ও কনিষ্ঠাকে ধনবানে অর্পণ করিয়া, কুঞ্জবিহারী নানা তীর্থে ধর্ম্মালোচনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

২

দীর্ঘ দুই বৎসর কাল নানা স্থান পর্য্যটনে কাটাইয়া কুঞ্জবিহারী একবার দেশে ফিরিলেন ; আসিয়া দেখিলেন, জ্যেষ্ঠ জামাতা সুবোধচন্দ্র তাঁহার উপদেশমত সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া সুখে দিনপাত করিতেছেন, কন্যাও স্বামিপ্রেমে সুখসৌভাগ্যসম্পন্না। তাহাদের শিশু কন্যাকে দেখিয়া কুঞ্জবিহারীর মনে হইল, গৃহত্যাগীও সহজে স্নেহের বন্ধন কাটাইতে পারে না।

কনিষ্ঠ জামাতার ব্যবস্থা দেখিয়া কুঞ্জবিহারী ব্যথিত হইলেন।

পিতার মৃত্যু হইতে না হইতে তাঁহারা তিন সহোদর তিনখানি 'উইল' বাহির করিয়া মোকর্দ্দমা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কুঞ্জবিহারী জামাতাকে বলিলেন, "এই তিনখানি 'উইলে'র হয় ত তিনখানিই জাল। অন্ততঃ দুইখানি যে জাল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাপ মনের অগোচর নহে। বৃথা এরূপ কার্য্য করিও না।" জামাতা বলিলেন, তিনি যে 'উইল' বাহির করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত। বিশেষতঃ অন্য দুইখানির যে কোনখানি যদি আদালতে প্রকৃত বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তবে তাঁহার বিশেষ স্বার্থহানি হইবে। এ অবস্থায় তিনি মোকর্দ্দমা ছাড়িতে পারেন না। কুঞ্জবিহারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জামাতার ভ্রাতৃদ্বয়কেও এ কথা বলিলেন; বলিয়া প্রকারান্তরে অপমানিত হইলেন।

ইহাও তিনি সংযমশিক্ষাগুণে অবিচলিতচিত্তে সহ্য করিলেন। কিন্তু যখন তিনি অমলার অশ্রু দেখিয়া বুঝিলেন, কন্যা সুখী নহে; তখন সংসারত্যাগীর হৃদয়ও ব্যথিত হইল। তিনি পুনরায় যাত্রার আয়োজন করিলেন।

কুঞ্জবিহারী সেইবার যাইবার সময় স্থির করিয়া যাইলেন, আর ফিরিবেন না। হইলও তাহাই। তিন বৎসর পরে সহচরের নিকট হইতে সুবোধচন্দ্র কুঞ্জবিহারীর পীড়ার সংবাদ পাইলেন। মৃত্যুশয্যায় সুবোধচন্দ্রের সহিত কুঞ্জবিহারীর সাক্ষাৎ হইল।

৩

কুঞ্জবিহারীর মৃত্যুর পর কয় মাস পরে তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা

বেণীমাধবের পিতার 'উইল' সম্বন্ধীয় মোকর্দ্দমা শেষ হইল। বিচারকগণ তিনখানি 'উইলে'র একখানিও প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। বহু কষ্টে তিন ভ্রাতা জাল করার অপরাধের অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়া আসিলেন। কিন্তু তিন বৎসরের অধিক কাল মোকর্দ্দমার জাবেদা ও বেজাবেদা ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সম্পত্তির অর্দ্ধেকের অধিক নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নষ্টাবশেষ তিন ভ্রাতা সমভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন। তখন তিন ভ্রাতায় পরস্পরে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

ভ্রাতায় ভ্রাতায় যখন মোকর্দ্দমা আরম্ভ হয়, তখনই তাঁহাদের কতকগুলি স্বার্থান্বেষী পার্শ্বচর জুটিয়াছিল। মক্ষিকাকে আর ব্রণের সন্ধান দিতে হয় না; সে সহজাত-সংস্কারবশে তাহার সন্ধান পাইয়া থাকে। এই সকল পার্শ্বচর নানা উপায়ে ভ্রাতৃত্রয়ের অর্থ নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই,—তাহাদিগকে কুপথগামী করিয়া তবে ছাড়িয়াছিল। মোকর্দ্দমা শেষ হইলেও তাহাদিগের আধিপত্য শেষ হইল না। তাহারা অবশিষ্ট সম্পত্তি শেষ করিতে সচেষ্ট রহিল।

এই সকল পার্শ্বচরের চেষ্টায় বেণীমাধব দিন দিন অধোগতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে গৃহে তাহার দর্শনলাভও দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল। অমলা দারুণ মর্ম্মব্যথায় ব্যথিতা হইতে লাগিল। সে নীরবে সব সহ্য করিল, মনের দুঃখ মনেই রাখিল। এক দিদি ব্যতীত তাহার দুঃখ জানাইবার আর কেহ নাই; কিন্তু সে সহোদরাকেও আপনার দুর্ভাগ্যের কথা জানাইল না। সে আপনি কাঁদিত, আর

ভাবিত, যদি তাহার একটি সন্তান থাকিত, তবে হয় ত শূন্যহৃদয় পূর্ণ হইত, সে এত দুঃখেও শান্তি পাইত। কিন্তু হায়! তাহার ত সে সৌভাগ্যলাভ ঘটে নাই! ক্রমে তাহার দুর্ভাগ্যের কথা নির্ম্মলার আর জানিতে বাকি রহিল না। সে ভগিনীর দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিল। কিন্তু সে কি বলিয়া ভগিনীকে সান্ত্বনা দিবে? তাহার দুঃখের কি কোনও সান্ত্বনা থাকিতে পারে?

শরীরের উপর অত্যাচার করিলে শরীর অমনই তাহা সহ্য করে না। ক্রমাগত অত্যাচারের ফলে বেণীমাধবের স্বাস্থ্যও তাহার ঐশ্বর্য্যের মত নাশের পথের পথিক হইল। অমলা শঙ্কিতা হইল।

৪

স্বামীর প্রেমসুখলাভ অমলার ভাগ্যে কোন দিনই ঘটে নাই। সে যে পূর্ব্বসুখের স্মৃতিমন্দিরে সুখ পাইবে, তাহার সে সৌভাগ্যলাভও হয় নাই। স্বামী কখনও তাহার হৃদয়ের পরিচয় পাইবার চেষ্টা করেন নাই। এখন আবার দুঃখের উপর দুশ্চিন্তার জ্বালা।

দেখিতে দেখিতে বেণীমাধবের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিকিৎসকগণের পরামর্শে বেণীমাধব পশ্চিম প্রদেশে গেল। অমলা সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যাকুলা হইল; স্বয়ং সে কথা বেণীমাধবকে বলিল; কিন্তু কোনও ফল হইল না। পার্শ্বচরবর্গকে লইয়া বেণীমাধব চলিয়া গেল। অমলা হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া কাঁদিল।

ভৃত্যবর্গ ব্যতীত বাটীতে দেখিবার অন্য লোক নাই। এই অবস্থায় অমলা ছয় মাস কাটাইল। তাহার পর বেণীমাধব ফিরিল।

ফিরিবার তিন চারি মাসের মধ্যেই অতিরিক্ত অত্যাচারে তাহার শরীর আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। বেণীমাধব আবার বিদেশে গেল, অমলা একাকিনী গৃহে রহিল।

দুই মাস পরে সংবাদ আসিল, বেণীমাধবের ভবলীলা শেষ হইয়াছে। অমলা অন্ধকার দেখিল। বেণীমাধবের ভ্রাতৃদ্বয় পূর্ব্ব-বিরোধবশতঃ তাহার সন্ধানও লইতেন না। পূর্ব্বে যখন সে একাকিনী থাকিত, তখনও তাহার ভরসা ছিল। এখন সে ভরসাও শেষ হইল। এ দিকে আবার বেণীমাধবের পাওনাদারগণ নালিশ করিতে আরম্ভ করিল। পিত্রালয়ে কেহ নাই। নির্ম্মলা ভগিনীকে লইয়া যাইতে চাহিলে, সে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না; করিবার উপায় পাইল না।

৫

অমলা ভগিনীর সংসারভুক্তা হইল। তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ স্নেহ এত দিন বাহির হইবার পথ না পাইয়া হৃদয়েই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহাকে ব্যথিত করিতেছিল। সেই স্নেহরাশি এখন সহস্র-ধারায় নির্ম্মলার একমাত্র সন্তান স্নেহের কন্যা সুষমাকে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইল। এত দিনে অমলার সুখ-লেশহীন জীবনে সুখের কিরণপাত হইল।

এ দিকে সুবোধচন্দ্র বেণীমাধবের সম্পত্তির ব্যবস্থা করিলেন। বেণীমাধবের অপব্যয় হেতুই আয়ে ব্যয় কুলাইত না। এখন ব্যয়ী আর নাই;—আয় সমস্তই সঞ্চিত হইতে লাগিল। অল্পদিনে সঞ্চিত ঋণরাশি শোধ হইয়া গেল। অমলা আপনার ধনসম্পত্তির কোনও সংবাদই

রাখিত না। সুবোধচন্দ্র সে সংবাদ দিতে আসিলেও সে শুনিতে চাহিত না। কিন্তু সুবোধচন্দ্র তাহাকে সব কথা বলিতেন। তাহার অর্থ তিনি স্পর্শও করিতেন না; তাহা স্বতন্ত্র হিসাবে তাহারই নামে জমা থাকিত।

এমনই ভাবে চারি বৎসর কাটিয়া গেল।

পঞ্চম বর্ষে দীর্ঘ দশ বৎসর পরে মৃত দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করিয়া নির্ম্মলার সব শেষ হইয়া গেল। মৃত্যুর অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্যেও নির্ম্মলা কন্যাকে ভুলিতে পারিল না। জননীর স্নেহ বুঝি মৃত্যুকে পরাজিত করে। সে মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হইয়াও কন্যার হাত ধরিয়া রোরুদ্যমানা ভগিনীর হস্তে অর্পণ করিল।

নির্ম্মলার মৃত্যুশোকে সুবোধচন্দ্র যেন বজ্রাহত হইলেন; কিন্তু স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যগুণে স্থির রহিলেন। অমলা তাহা পারিল না;—সে একেবারে অধীরা হইয়া পড়িল। এই সময় মাতৃহীনা সুষমা পীড়িতা না হইলে সে বোধ হয় অশান্ত হৃদয় শান্ত করিতে পারিত না। সুষমার যখন প্রবল জ্বর হইল, তখন অমলা আবার উঠিল। কয় দিন জ্বরভোগের পর সুষমা সারিল। তখন তাহার সকল ভার অমলার। মাতৃহারা কন্যা শোকের দারুণ আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই রোগের কণ্টকশয়নে পতিত হইয়াছিল। সে অতি ধীরে নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল;—সেও বুঝি অমলার অক্লান্ত শুশ্রূষাগুণে। অমলা যেরূপ যত্নে তাহার শুশ্রূষা করিত, বুঝি নির্ম্মলাও সেরূপ পারিত না। পতিপ্রেমসুখস্বাদহীনা, সংসারের সর্ব্বসৌভাগ্য-বঞ্চিতা, বন্ধ্যা রমণীর হৃদয়ের সে-ই একমাত্র অবলম্বন।

৬

ভগিনীর মৃত্যুতে সংসারের সকল ভার অমলার স্কন্ধে পতিত হইল। সুবোধচন্দ্রের শোকবিক্ষত হৃদয়ে আশঙ্কার ছায়াপাত হইয়াছিল,—বুঝি বা সংসারের যে সব খুঁটিনাটি কখনও দেখেন নাই, এখন সে সব দেখিতে হইবে। ধনী বৃহৎ কলের লাভমাত্র ভোগ করে; কলটি চালাইতে কত শ্রম, কত চিন্তা, কত বাধা, কত বিপদ,—সে তাহার সন্ধান রাখে না; তেমনই সংসারের খুঁটিনাটিতে কত যাতনা, কত ভাবনা, কত শ্রম, কত বিরক্তি, পুরুষ তাহা জানিতে পারে না। রমণী, গৃহিণীরূপে সে সব সহ্য করিয়া পুরুষের জন্য সুখটুকু আনিয়া দেন। সুবোধচন্দ্রের আশঙ্কা অচিরে ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হইল। অমলার হস্তে সংসারের সব কার্য্য পূর্ব্বেরই মত চলিতে লাগিল। বাস্তবিক সুবোধচন্দ্র জানিতেন না, নির্ম্মলার জীবিতাবস্থাতেই সংসারের ভার অমলাই বহুপরিমাণে বহন করিত। সুবোধচন্দ্র এখন বুঝিলেন,—পরিবর্ত্তন সংসারে নহে—হৃদয়ে।

দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর সুষমার বিবাহ হইল।

বর-কন্যা চলিয়া যাইলে অমলা ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিল। তাহার ব্যথিত, তপ্ত, কাতর হৃদয় এত দিন যাহাকে লইয়া সব ভুলিয়াছিল,—সেও আজ চলিয়া গেল। এখন সে আর কি লইয়া দিন কাটাইবে, কি লইয়া থাকিবে?

৭

শূন্য গৃহে সুবোধচন্দ্র ও অমলা পরস্পরের অত্যন্ত নিকটে উপনীত হইলেন। অমলা প্রথম হইতেই সুবোধচন্দ্রকে ভক্তি করিত। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অনন্যসাধারণ পূতাচার, অসাধারণ জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা, স্নেহপ্রবণ হৃদয়, এ সবই অভাগিনীর নিকট নূতন। শৈশবে সে পিতাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারে নাই; নহিলে তাঁহাতে এই সব গুণ দেখিতে পাইত। সে বড় হইতে না হইতেই তিনি গৃহত্যাগী হয়েন। তাহার পর তাহার ভাগ্যবিধাতার চরিত্রে সে এ সব সদ্‌গুণ দেখিতে পায় নাই। এখন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে সে ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইল।

এ দিকে সুবোধচন্দ্র এত দিন অমলার কার্য্য ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার সুযোগ পান নাই, এখন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যতই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, ততই অমলার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

এই ভাবে বর্ষাধিক কাল কাটিয়া গেল। দুই জনের হৃদয়ে শ্রদ্ধা বদ্ধমূল হইতে লাগিল। প্রেম যৌবনের স্বপ্নমাত্র; শ্রদ্ধাই প্রকৃত সুখের ভিত্তি। প্রেম কল্পনা, শ্রদ্ধা বাস্তব। প্রেমের সদাচঞ্চল ঊর্ম্মিলীলায় কেবল অস্থিরতা; শ্রদ্ধা, স্থির, ধীর, গভীর। দুইটি শূন্য হৃদয় যখন প্রকৃত অনাবিল শ্রদ্ধায় পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয়, তখনই প্রকৃত সুখের ভিত্তি দৃঢ় হয়।

ক্রমে এমনই দাঁড়াইল যে, একের জীবন-স্রোত অপরের দিকেই প্রবাহিত হইতে লাগিল। সুবোধচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন।

তিনি চিত্তবৃত্তি-সংযমক্ষম,—চিত্তবৃত্তি সংযত করিলেন; কিন্তু উন্মূলিত করিতে পারিলেন না। অমলা তাহা বুঝিল;—সে দৃঢ় সংযমে চিত্তবৃত্তি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট হইল। রমণীর—বিশেষতঃ হিন্দুরমণীর—সংযম বহুকালব্যাপী সাধন হেতু স্বভাবের অংশবিশেষে পরিণত হয়। আজ হৃদাকাশের দূরপ্রান্তে পবনচঞ্চল ধূমের মত মেঘ দেখিতে না দেখিতে সে সতর্ক হইল;—তরণী বন্দরে আনিয়া নিরাপদ হইবার চেষ্টা করিল। দুর্ব্বলের শেষ বল, ঝটিকা-তাড়িত তরণীর দৃঢ় নোঙ্গর, ধর্ম্মের আশ্রয় লইল। সে ধর্ম্মাচরণে, পূতাচারে, সংযমাভ্যাসে হৃদয়ের প্রকৃত বল প্রবল করিতে লাগিল। দিন কাটিতে লাগিল।

৮

দুই জন বন্দীর মধ্যে যে জানে যে, কারাগার-গবাক্ষপথে সে অনায়াসে বাহির হইয়া যাইতে পারিবে, সে সহজে আপনার অবস্থায় শান্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু যাহাকে কেবলমাত্র হৃদয়বলে কারাবাসেই শান্ত থাকিতে হয়, সে তত সহজে শান্তি পায় না। অমলা ধর্ম্মের আশ্রয়ে হৃদয়াবেগ হইতে পলায়নের সঙ্কীর্ণ পথ পাইল। কিন্তু সুবোধচন্দ্রের চিত্তবৃত্তি-দমন প্রবল মানসিক চেষ্টার ফল। তাই তাঁহার সাফল্যলাভের অসাধারণ চেষ্টা অমলা জানিতে পারিল।

কয় মাস কাটিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে শীতের পর বঙ্গের স্বল্পায়ু বসন্ত আসিয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। নিদাঘ-সমীরে বসন্তের নিশ্বাস মিশিল। তরুলতা যেন ব্যস্ত হইয়া ভাণ্ডার

শূন্য করিয়া ফেলিবার জন্য অত্যধিক কুসুমশোভায় শোভিত হইল। অমলা প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহকার্য্য করিতেছিল। সুবোধচন্দ্র প্রাত-র্ভ্রমণে বাহির হইলেন। অমলা দেখিল,—তাঁহার মুখ শুষ্ক, নয়নের চারি পার্শ্বে অনিদ্রাপরিচয় কালিমা। তিনি বাহির হইয়া যাইলেন। অমলা তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। হর্ম্ম্যতলে কতকগুলি ছিন্ন ও অর্দ্ধছিন্ন কাগজ,—সুবোধচন্দ্র কি লিখিয়াছেন, আর ছিঁড়িয়াছেন। এক খণ্ড কাগজ তুলিয়া লইয়া অমলা দেখিল,—একটি অসমাপ্ত কবিতা,—

আমার আঁধার হৃদয়-মাঝারে
জ্বালিলে দুরাশা কেন?—
সুপ্ত বহ্নি ইন্ধন-ভারে
দ্বিগুণ উজল যেন।
শুষ্ক-হৃদয়ে মূর্চ্ছিত প্রেম,
কেন চিয়াইলে তায়;
মরুভূমি মাঝে মলয় অধীর
কেন আর বহে যায়?
অসীম-আঁধার-অম্বর-তলে
আঁধার সরসী-জল,—
কেন ফুটাইলে হৃদয়ে তাহার
মুদিত কমলদল?

সম্মুখে মোর কর্ম্ম-সরণী—
মৃত্যু-আঁধারে শেষ;
পশ্চাতে ডাকে মায়া-মরীচিকা—
চিরপরিচিত দেশ।
পিচ্ছিল পথ, শ্রান্ত চরণ,—
বাসনা-বাঁশরী ডাকে;—
চিরপরিচিত শত সুখ-ছবি
স্বপন নয়নে আঁকে।
কোথা তুমি আজি? লুব্ধ হৃদয়—
নিবাও এ আশা তা'র;
পুরিবার নহে যে বাসনা, তা'রে
হৃদয়ে জ্বেল না আর।

অমলা পাঠ করিল। তাহার কম্পিত হস্ত হইতে কাগজখানি পড়িয়া গেল,—তাহার চক্ষুর সম্মুখে সে কক্ষ যেন ঘুরিতে লাগিল। সে

যেন আপনার নিকট হইতে পলায়নের জন্য ব্যাকুলা হইল। কক্ষ ত্যাগ করিতে যাইয়া দৃষ্টি তুলিয়া অমলা দেখিল,—কক্ষ-প্রাচীরে তাহার দুরদৃষ্ট-দাবানল-দগ্ধ জীবনের সুখ ও শান্তি, আশ্রয় ও আরাম,—ভগিনীর চিত্র। নিপুণ আরোহী যেমন বল্গাকর্ষণে উচ্ছৃঙ্খল অশ্বের বেগ শান্ত করে, অভ্যস্ত-সংযম-সাধনা অমলা তেমনই প্রবল চেষ্টায় হৃদয়-বেগ সংযত করিল।

অমলা আপনার কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার পর ক্ষতবিক্ষতহৃদয়ে বেদনায় হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দর-বিগলিত নয়নধারায় হৃদয়ের দারুণ যাতনা প্রশমিত হইল। তখন সে হৃদয়দৌর্ব্বল্যে যে আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছিল, সেই আশ্রয় দ্বিগুণ আবেগে আঁকড়িয়া ধরিল। হে দেবতা! তুমিই অস-হায়ের সহায়, আমার হৃদয়ে বল দাও; আমি বিপন্ন, আমাকে রক্ষা কর; আমি স্রোতোমুখে লঘু তৃণখণ্ডবৎ ভাসিয়া অকূলে যাইতেছি, আমাকে কূলে ফিরাও; আমি ভ্রান্তিপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছি, আমাকে উদ্ধার কর; আমাকে বাসনাবহ্নিশিখামুগ্ধ পতঙ্গের মৃত্যু হইতে দূরে রাখ।

সে কতক্ষণ তদ্গতচিত্তে ধ্যানমগ্ন ছিল, তাহা সে স্বয়ং জানে না। দাসী আসিয়া যখন দ্বারে করাঘাত করিয়া তাহাকে ডাকিল, তখন সে চমকিয়া উঠিল। তখন সে শান্ত, প্রকৃতিস্থ।

সে উঠিল। বিধবার শুক্লাম্বরে তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে হৃদয়ে আরও বল পাইল; পূতাচার, কঠোরাচার, ধর্ম্মাচরণ—এই

সকলেই তাহার অধিকার। চিরাগত আচারে সে ত সংসারে থাকিয়াও সংসারবিরাগী; ভোগী নহে—ত্যাগী, বিলাসী নহে—সংযমী। সে যেন নূতন আলোকে নূতন পথ দেখিতে পাইল।

৯

অমলার হৃদয়ের সহিত প্রবল সংগ্রাম প্রবলতর বেগে আরব্ধ হইল। সে সঙ্কল্প করিল, হয় মৃত্যু,—নয় উদ্ধার; হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, যাউক; বাসনার লেশমাত্র থাকিতে তাহাকে শান্তি দিবে না। অতিরিক্ত আকর্ষণে রজ্জু ছিন্ন হইয়া যায়। এই প্রাণান্ত চেষ্টায় অমলার স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও নানা দুর্ঘটনার আঘাতে দুর্ব্বলতর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার চারি দিকে মৃত্যুর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

অমলা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। সুষমা ইহার পরবার পিত্রালয়ে আসিয়া "মাসীমা"র মূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইল। সে বলিল, "মাসীমা, তোমার কি অসুখ?" অমলা সে কথা আমলে আনিল না। তখন সুষমা পিতাকে জানাইল, অমলার শরীরের যে অবস্থা, তাহাতে নিশ্চয়ই তাহার কোনও সাঙ্ঘাতিক পীড়া হইয়াছে। সুবোধচন্দ্র উদ্বিগ্ন হইলেন। উভয়েই অমলাকে চিকিৎসার জন্য জিদ করিলেন। অমলা সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তাহার কোনও রোগ নাই, সে কি জন্য চিকিৎসিত হইবে? হাসির মত মনোভাব গোপনের উপায় আর নাই।

অমলা কিছুতেই পীড়ার কথা স্বীকার করিল না। কোন্

চিকিৎসক তাহার মর্ম্মপীড়ার ভেষজ-প্রদানে সক্ষম? বুঝি বা সে বুঝিয়াছিল যে, সকল ব্যাধির শান্তি মরণৌষধ ব্যতীত তাহার এ পীড়া দূর হইবে না; বুঝি তাই সে ব্যাকুল আবেগে কেবল তাহারই জন্য ব্যস্ত হইতেছিল।

তাহার এই অবস্থা দেখিয়া সুষমা প্রায়ই শ্বশুরালয় হইতে তাহাকে দেখিতে আসিত; মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকিত। সে কেবল চিকিৎসার জন্য জিদ করিত। তাহার বাসনা অপূর্ণ রাখিতে অমলার নয়নে অশ্রু আসিত। কিন্তু এ বিষয়ে সে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল; সে কিছুতেই ঔষধসেবন করিল না।

এমনই ভাবে তিন মাস কাটিল। চতুর্থ মাসে পীড়া সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করিল। সুষমা কাঁদিল,—জিদ করিয়া চিকিৎসক আনাইল। চিকিৎসক অত্যন্ত—চিকিৎসাতীত দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কোনও পীড়া বুঝিতে পারিলেন না। তবুও রোগিণীকে আশ্বাস দিবার চেষ্টায় তিনি বলিলেন, "চিকিৎসায় অতি অল্প দিনেই রোগ সারিবে।" শুনিয়া অমলা হাসিল। সে জানিত, মৃত্যুর প্রসারিত কর তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে; আর কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

১০

রোগশয্যায় অমলার যন্ত্রণার নূতন কারণ উপস্থিত হইল। যখন রোগশয্যায় আর নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকা যায় না, তখন বিক্ষিপ্ত মনোবৃত্তি সকল আত্মস্থ হইয়া প্রবল আকার ধারণ করে;—সঙ্গে সঙ্গে

পর্য্যবেক্ষণশক্তিরও বৃদ্ধি হয়। তাই অন্য সময় নানা কার্য্যের মধ্যে লোক যাহা লক্ষ্য করিতে পারে না, রোগশয্যায় তাহা সহজেই লক্ষ্য করে। আবার যাহার লক্ষ্য করিবার উপাদান অল্প, সে সেই অল্প উপাদানই বিশেষভাবে লক্ষ্য না করিয়া পারে না। তাই অমলা পূর্ব্বে সুবোধচন্দ্রকে যেমন করিয়া লক্ষ্য করে নাই, এখন তেমন করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল। লক্ষ্য করিয়া তাহার বেদনা কেবল বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সুবোধচন্দ্রের অবস্থা লক্ষ্য করিলে যে কেহ ব্যথিত হইত। তাঁহার মুখে অকাল-বার্দ্ধক্যের নিবিড় ছায়া, মুখভাবে হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণার পরিচয়। লক্ষ্য করিয়া অমলা কেবল হৃদয়ে বেদনা পাইত। সে তাঁহার যন্ত্রণার কারণ জানিত; নারীজনসুলভ উদারতাগুণে আপনাকে অপরাধিনী বিবেচনা করিত। কিন্তু তাহার অপরাধ কোথায়? সে তাহা বুঝিত না।

ঘৃতাহুতিসংযোগে পাবক যেমন প্রবল হইয়া সহজেই দাহ্য পদার্থ ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, এই নূতন মানসিক যন্ত্রণার সংযোগে অমলার হৃদয়-সংগ্রাম তেমনই তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট করিয়া দিল। শ্রাবণের শেষে দিন নিতান্তই ফুরাইয়া আসিল।

সুষমা কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই অমলার শুশ্রূষার জন্য শ্বশুরালয় হইতে আসিয়াছিল। এখন সে সর্ব্বদাই তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতে চাহিত। অমলা অনেক সময় জিদ করিয়া তাহাকে তুলিয়া দিত, বলিত,—সুষমা বিশ্রাম করিতে না গেলে সে স্বয়ং কিছুতেই

স্থির হইতে পারিবে না। অমলা সেই অবস্থায়ও যাহাতে সুষমা যথা-কালে আহার করে, রাত্রিজাগরণ না করে, সে জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিত। সে রোগ-যন্ত্রণা হাসি-মুখে সহ্য করিত; তাহার সহিষ্ণুতা দেখিয়া চিকিৎসকগণও বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

এইরূপে প্রায় এক সপ্তাহ কাটিল। জীবন-স্রোত ক্রমেই ক্ষীণ হইতে লাগিল।

১১

অপরাহ্ণ হইতে গগনব্যাপী ঘন মেঘে যে বর্ষণ চলিতেছিল, মধ্য-রাত্রির পর হইতে তাহার বেগ মন্দীভূত হইয়া নিশাবসান-সূচনাকালে তাহার ক্ষণিক বিরাম হইয়াছে। যদিও রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু মেঘান্ধকারে দিবালোকবিকাশের ক্ষীণ প্রারম্ভ আচ্ছন্ন। সারা-রাত্রির জাগরণ-শ্রমের পর সুষমা পার্শ্বের কক্ষে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। অমলার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সুবোধচন্দ্র একাকী প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর ফুৎকারে অমলার জীবন-দীপ-নির্ব্বাণের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বহুক্ষণ মোহাচ্ছন্ন থাকিবার পর অমলার নয়ন উন্মীলিত হইল। সুবোধচন্দ্র দেখিলেন, নয়নে বিকার-লক্ষণ নাই। তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল। মৃত্যুর সম্মুখে আজ তাঁহার এত দিনের সংযম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। সুবোধচন্দ্র আর পারিলেন না; তিনি বিকলবৎ বলিলেন,—"অমলা! আজ তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব, তুমি আমার জীবনে কি ছিলে? আমি—" সুবোধচন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, আর কথা বাহির হইল না।

অমলা সুবোধচন্দ্রের কথা শুনিল ; নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখায় যেন ঝটিকাঘাত লাগিল। সে শিথিল শক্তিতে দশনে অধর-নিষ্পেষণের চেষ্টা করিল ; পাছে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাহার এত দিনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহারও সংযম-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, যে বাসনা নির্ম্মূল করিবার জন্য সে এত দিন প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছে, সেই বাসনা আজ আত্মপ্রকাশ করে। মুহূর্ত্ত পরে ক্ষীণ অন্তিম হিক্কায় তাহার ব্যয়িতশক্তি দেহের সেই শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল ; ধীরে ধীরে শীর্ণ অধর যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন-সংগ্রাম ও হৃদয়-সংগ্রাম—উভয়েরই শেষ হইয়া গেল।

ভুল।

১

মানবজীবন নদীর স্রোতের মত ; ঘটনার পর ঘটনার তরঙ্গ তাহার বক্ষ বিলোড়িত করে। তরঙ্গহীন নদীস্রোত নাই ; ঘটনাহীন মানবজীবন নাই। নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ যেমন উঠে, আবার মিলাইয়া যায়, কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না, মানবজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও তেমনই কোন অলজ্ঘ্য, অচিন্তনীয় কারণে আইসে যায়, কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না। নদীর এক একটা বৃহৎ তরঙ্গ যেমন তীরে আপনার চিহ্ন রাখিয়া যায়, মানবজীবনের এক একটা বৃহৎ ঘটনা তেমনই হৃদয়ে চিরস্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায় ; কালের করস্পর্শেও সে চিহ্ন মুছে না। সকলেরই জীবনে সেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে ; তবে কোন ঘটনায় আমরাই কর্ত্তা, কোন ঘটনায় আমরা কোন না কোনরূপে বিজড়িত। আমি আমার জীবনের একটা সেইরূপ ঘটনার কথা বলিব।

ভবেশ আমার বাল্যবন্ধু। বাল্যকালে আমরা পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন—"বাল্য-কালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে।" বাল্যকালে যাহাদিগের সহিত এত ভালবাসা ছিল, আজ তাহারা কে কোথায় ?

ভুল।

সংসারের স্রোত নানা জনকে নানা দিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে ; সে অতীত জীবন যেন স্বপ্নের মত হইয়া গিয়াছে। আজ এই সংসারে পুত্রকন্যাপরিবেষ্টিত হইয়াও কিন্তু সে স্বপ্ন বড় মধুর বলিয়া মনে হয়।

সংসারে প্রবেশের পরও ভবেশের সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত। পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা আমার একটা বাতিক বিশেষ। তাহার পর একেবারে বর্ষাধিক কাল ভবেশের কোনও সংবাদ পাই নাই। ইহার মধ্যে একবার কোন বিবাহ-বাটীতে আমার পত্নীর সহিত ভবেশের পত্নীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গৃহিণী আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, ভবেশের পত্নী বড় কৃশ হইয়াছেন, আর গৃহিণী ভবেশের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। আমি সে কথায় বড় কাণ দিই নাই ; রমণীর অশ্রু আমার নিকট নিতান্তই সহজ ও সুলভ বলিয়া বোধ হয়।

২

ইহার পর এক দিন এক বন্ধুর কাছে শুনিলাম যে, ভবেশ আবার বিবাহ করিবে। কথাটা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আবার যে ভবেশ বিবাহ করিবে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। সেই দিন বন্ধুগৃহ হইতে গৃহে ফিরিবার পথে আমি ভবেশের গৃহে গমন করিলাম। ভবেশের দেখা পাইলাম না।

তাহার পর দিন ভবেশকে একখানা পত্র লিখিলাম।

চারি দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল—সুদীর্ঘ পত্র। সেই পত্র পাঠ করিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভবেশ লিখিয়াছে,—সে কথা সত্য! সে লিখিয়াছে,—

"আমি যে যাতনা সহিয়াছি, তাহা আর কি বলিব? বিবাহের পরেই দেখিলাম, আমি আকাশে ঘর বাঁধিতেছিলাম। দেখিলাম, আমার কথা, আমার আশা, আমার পত্নীর নিকট দুর্বোধ প্রহেলিকা, তাঁহার কথা আমার নিকট শিশুসুলভ। ছেলেখেলার জন্য কি বিবাহ করিয়াছিলাম! এ যে আমার খেলার সাথী; জীবনের মহদনুষ্ঠানে এ ত আমার সহায় সহচর নহে! তবে এ কি করিয়াছি? কেন এ ভুল করিলাম? তখনই দেখিলাম—

'সে কি জানে কি প্রেম-ভাণ্ডার পুরুষের বিশাল হৃদয়?
সে কি জানে নিজ অধিকার কি বিস্তৃত কি শকতিময়?
বুঝালে কি বুঝিবে আমার অতীত সমর-পরাজয়?
এ আমার বিলাস-সাধন, আত্মার সঙ্গিনী এ ত নয়!'

"দেখিয়া ব্যথিত হইলাম। তবুও একবার তাঁহাকে 'আত্মার সঙ্গিনী' করিবার চেষ্টা করিলাম। প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম, সব চেষ্টা বিফল হইল।

"আমার কর্ত্তব্য আমি করিলাম। যখন বিফলমনোরথ হইলাম, তখন বুঝিলাম, জীবনে যে সুখের আশা করিয়াছিলাম, তাহা পাইব না। এ মরুময় জীবন লইয়া জগতে কোনও কার্য্যই

সাধন করিতে পারিব না। এ নিষ্ফল জীবন কেবল দুঃখ-যন্ত্রণার ইতিহাস হইবে। যেমন ঔৎসুক্য হইতে আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে প্রেম ভালবাসার ক্রমবিকাশ, তেমনই তাহার আবার ক্রমনিবৃত্তি আছে ; প্রেম হইতে উপেক্ষা, উপেক্ষা হইতে বিরক্তি, বিরক্তি হইতে ঘৃণা। ঘটনায় যেমন প্রেম বিকশিত হয়, তেমনই আবার ঘটনায় প্রেমের নিবৃত্তি হয়।

"আমার প্রেম ক্রমে ক্রমে উপেক্ষায় পরিণত হইল। আমি আমার পত্নীর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তিনি তাঁহার হাসি, গল্প, বসন, ভূষণ লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন।

"তাঁহার প্রতি আমার আর কি কর্ত্তব্য ছিল? তাঁহার ভরণ-পোষণের জন্য আমি দায়ী—সে দায়িত্ব আমি অস্বীকার করি না। আমার কার্য্য আমি করিয়াছি, করিতেছি, এবং করিব। তাহার পর আমার আর কি কর্ত্তব্য আছে? তিনি আমার অভিপ্রায় মত কার্য্য করেন নাই, তিনি আমার নিকট আবার কি প্রত্যাশা করিতে পারেন? আমি জীবনে যে কি যাতনা সহ্য করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যদি তিনি এতটুকু চেষ্টা করিতেন, যদি আপনার এতটকু উন্নতি সাধিত করিতেন, যদি আমার মনোমত হইবার জন্য এতটুকু চেষ্টা করিতেন! আমি কি করিয়াছি, কি যাতনা সহিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।"

তাহার পর ভবেশ এমনই নানা কথা লিখিয়াছে। কথাগুলা বড়ই বেদনায় বাহির হইয়াছে। পড়িয়া ভবেশের জন্য দুঃখ হইল,

কিন্তু আমার মনে হইল, কোথায় একটা বড় ভুল হইয়াছে, তাই এত গণ্ডগোল। আর আমার মনে হইল, ভবেশ আপনার পায় আপনি কুঠার মারিয়াছে; আর এক জনের উপর, বিশেষ স্ত্রীর উপর, কি অত আশা স্থাপন করিতে আছে? ও বিষয়ে আমার মত স্বতন্ত্র; আমি আমার বন্ধুবান্ধব, উপন্যাসপাঠ, পার্টি, চুরুটের পাইপ, হাওয়া খাওয়া, এই সব লইয়া আছি; গৃহিণী তাঁহার ছেলে মেয়ে, গৃহকর্ম্ম, হাঁড়ি কুড়ি লইয়া ব্যস্ত আছেন;—একটু পশমের কারু কার্য্য, তাহাও এক ছেলের মা হইয়াই ছাড়িয়াছিলেন। আমার অসুখটা কিসের? তবে মধ্যে মধ্যে একটু ঝগড়া ঝাঁটি, মান অভিমান,—কোন্ স্বামীস্ত্রীর তাহা নাই? আমি ত বেশ সন্তুষ্ট আছি; গৃহিণীরও কোনও অসুখ দেখি না। ছেলে মেয়ের অসুখের সময় তাঁহার মুখখানি একটু মলিন হয়, নহিলে নহে।

পত্রের শেষে ভবেশ লিখিয়াছে:—

"আজ কয় মাস হইল, একদিন একটা সামান্য কথা লইয়া তাঁহার সহিত একটু বাদানুবাদ হইয়াছিল; তাঁহার কথার ভাবে আমার বোধ হইয়াছিল, আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা নাই। সেই দিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'তোমার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ না হইলে বোধ করি তুমিও ভাল থাক, আমিও ভাল থাকি।' তাহার কয় দিন পরে তিনি পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে আনিবার চেষ্টা করি নাই, তিনিও আইসেন নাই।

সত্যই আমার মনে হয়, প্রণয়হীন পরিণয় অপেক্ষা পরিণয়হীন প্রণয়ও ভাল।

"তিনি আমাকে ভালবাসেন নাই—ভালবাসেন না। আমার হৃদয়ের ভালবাসা এখন বিরক্তিতে, ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে। আমিও মানুষ, আমারও হৃদয় আছে, আমিও প্রতিহিংসা লইতে পারি। আমার যথাসাধ্য আমি করিয়াছি; আমি আমার কর্ত্তব্য-পালনের চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। আমি তাঁহাকে যত ভালবাসিয়াছি, কোন্ স্বামী স্ত্রীকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াছে?—কোন স্বামী স্ত্রীকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে পারে? আমার দোষ কি?"

৩

ভবেশের পত্র পড়িয়া ভাবিলাম, এ পত্রের উত্তর দেওয়াই ভাল। আমি লিখিলাম,—

"তোমার পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য ঘটা কোনও মতেই অভিপ্রেত নহে। তুমি এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আবার বিবাহ করিতে চাহিতেছ, ভাল করিয়া বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিও না। তোমার নৈতিক আপত্তির কথায় আমি তোমার সহিত একমত। আমাদিগের পিতামহদিগের সময় একাধিক বিবাহ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। এখন আমরা প্রাচ্য আদর্শ ত্যাগ করিয়া প্রতীচ্য আদর্শ লইয়াছি—তাই এরূপ বিবাহে এখন আমাদিগের আপত্তি। কিন্তু আমাদিগের সমাজে প্রতীচ্য আদর্শ

ষোল আনা বজায় রাখা কি সম্ভব? য়ুরোপে যাহাতে 'ডাইভোস' অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদ আছে, এ দেশে সে অবস্থায় স্বামীর পক্ষে আবার বিবাহ করা কি দোষের? তবে কোন বিশেষ কারণ ভিন্ন আমি এক স্ত্রী বর্ত্তমানে স্বামীর আবার বিবাহের পক্ষপাতী নহি। আমি পুরুষ বা রমণী কাহারও একাধিকবার বিবাহেরই পক্ষপাতী নহি। তবে যে স্থলে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসেন না, স্বামীর যত্ন ও ভালবাসা চাহেন না, স্বামীর নিকট থাকিতে চাহেন না, সে স্থলে স্বামী যদি স্ত্রীর অভাব অনুভব করিয়া আবার বিবাহ করেন, তবে আমি তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। স্ত্রীর সম্বন্ধেও আমি এই কথা বলিতাম; কিন্তু সমাজের শাসন অন্যরূপ, আইনের বিধান

"তুমি লিখিয়াছ, প্রতিহিংসা লইবে। কাহার উপর? স্ত্রীর উপর? তুমি লিখিয়াছ, তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালবাসেন না;—যে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে না, সে স্ত্রী কি স্বামী আবার বিবাহ করিলে ব্যথিতা হয়? কখনই নহে। তবে কি আপনার প্রতি প্রতিশোধ লইবে? স্ত্রীকে এত ভালবাসিয়াছিলে বলিয়া আপনার উপর রাগ করিয়াছ; তাই আপনার উপর প্রতিশোধ লইতে চাহিতেছ।

"আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি এখনও তোমার স্ত্রীকে ভালবাস। ভালবাসা যাইবার নহে। তিনি বহুদিন ধরিয়া তোমাকে সুখী করিয়াছেন; সত্য, তুমি তোমার আপনার প্রেমো-

চ্ছ্বাসে মগ্ন ছিলে, কিন্তু সে প্রেম ত তাঁহাকে দেখিয়াই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল! কই, বিবাহের পূর্ব্বে ত সে প্রেমসুখ পাও নাই! আমার অনুরোধ, সেই প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া আরও একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বল। স্ত্রী যদি না বুঝিয়া কোন দোষ করেন, তবে স্বামী তাঁহার সংশোধনের চেষ্টা না করিলে আর কে করিবে?

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, একটা কি ভুল হইয়াছে, তাই এত গণ্ডগোল। যাহা কর, অল্পক্ষণস্থায়িনী উত্তেজনার বশে একটা কায করিয়া সারা জীবন কষ্ট পাইও না। আর একবার ভাবিয়া দেখ—এক পত্নীতে যে অসুখ পাইয়াছ, অন্য পত্নীতে যে তাহাই পাইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে?"

৪

আমি ভবেশকে এই পত্র লিখিয়া, গৃহিণীকে ভবেশের স্ত্রীকে একখানা পত্র লিখিতে বলিলাম। গৃহিণী একেবারে অস্বীকার করিলেন—তাঁহার এ ছাই হাতের লেখাও কি লোকের কাছে দেখাইতে আছে? ছিঃ! সে লোকের বাহিরে কেবল তাঁহার স্বামীটি। গৃহিণী সোজা কথায় স্পষ্ট বলিলেন, "আমি তাহা পারিব না।" অনেক কষ্টে তাঁহাকে বুঝাইলাম, ব্যাপার গুরুতর, এ সময় তিনি একটু লজ্জা ত্যাগ করিলেই ভাল।

গৃহিণী চলিয়া গেলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে একখানা পত্র আনিয়া আমাকে দেখাইলেন। পত্র দেখিতে আমার ইচ্ছা ছিল

না ; এক জন মহিলা আর এক জন মহিলাকে পত্র লিখিতেছেন,— আমি তাহার কি দেখিব ? গৃহিণী ছাড়িলেন না।

দেখিলাম,—গৃহিণী ভবেশের পত্নীকে স্বামীকে পত্র লিখিতে বলিয়াছেন, স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিতে লিখিয়াছেন, স্বামীর কাছে যাইতে লিখিয়াছেন। স্বামীই স্ত্রীর পরম দেবতা, তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিতে দোষ নাই। স্বামী যাহার উপর অসন্তুষ্ট, সে স্ত্রীর জীবনে সুখ কি ?—ইত্যাদি।

পত্রে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি ছিল, সেগুলি সংশোধন করিয়া আমি দুইখানা পত্রই ডাকে পাঠাইয়া দিলাম।

৫

প্রত্যাশিত দিবসে গৃহিণীর পত্রের উত্তর আসিল। ভবেশের পত্নী লিখিয়াছেন,—

"দিদি,—আমার দুঃখের কথা শুনিয়া তুমি আমাকে পত্র লিখিয়াছ। আমি এত দিন যে যাতনা সহিয়াছি, তাহা আর কি বলিব ? আমার এ দুঃখের কথা কাহাকেও বলিতেও পারি না।

"মা'র অসুখের কথা শুনিয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছিলাম, তাহার পর এত দিন একবার আমার সংবাদও লইলেন না ! আমি তাঁহার অনুপযুক্ত ; কিন্তু আমি ত তাঁহার স্ত্রী বটে ! আমারই কি ইচ্ছা নহে যে, আমি তাঁহার মনের মত হই। আমি কি চেষ্টা করি নাই ? তাঁহার মনের মত হইতে পারিলে লাভ কাহার ? সে ত আমারই ! আর যদি তাঁহার মনের মত হইতে না পারিলাম,

যদি তাঁহার ভালবাসা না পাইলাম, তবে, দিদি, এ ছাই নারীজন্মে কি ফল! আমি এত চেষ্টা করিলাম, তাঁহার মনের মত হইতে পারিলাম না। আমাকে কোন বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলে, আমি কিছু বুঝিতে না পারিলে, বা আগাগোড়া ভুল বুঝিলে, হতাশ হইয়া ম্লানমুখে তিনি যখন উঠিয়া যাইতেন, তখন, দিদি, তাঁহার অপেক্ষা আমার কষ্ট কি কম হইত! আমি আবার বুঝিতে চেষ্টা করিতাম, তাঁহার সেই ম্লানমুখের কথা মনে পড়িত, আর পোড়া চক্ষুতে জল ধরিত না। তিনি কি আমার ব্যথা বুঝিতে পারিতেন! আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে সে কথা বুঝাইব?

"আমি কি বুঝিতাম না যে, এই হতভাগিনীর জন্যই তাঁহার কিছু ভাল লাগিত না, তিনি সারাদিন একলা কি ভাবিতেন, বন্ধু-বান্ধবের কাছেও যাইতেন না? বুঝিতাম; কিন্তু কি করিব, আমি এত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মনের মত হইতে পারিলাম না! তিনি বলিতেন, আমার কথা তাঁহার নিকট শিশুসুলভ বলিয়া বোধ হইত। তাই ত আমি তাঁহার কথা বুঝিতে পারিতাম না। তিনি যদি আমার বুঝিবার মত করিয়া বুঝাইতেন, তবে হয় ত আমি বুঝিতে পারিতাম; নহিলে আমি বুঝিব কেমন করিয়া? আমি কেবল কাঁদিতাম।

"তাহার পর তিনি আর পূর্ব্বের মত ব্যবহার করিতেন না। বলিলে, আমাকে আমার হাসি, গল্প, বসন, ভূষণ লইয়া থাকিতে বলিতেন। তাঁহার কথা বুঝিবার চেষ্টা আমি করি নাই! তাঁহার

মনের মত হইবার ইচ্ছাও আমার নাই! বসন-ভূষণেই কি আমার সুখ? আমার নিকট তাঁহার ভালবাসার অপেক্ষা কি বসনভূষণই বড়? বসনভূষণ হইলেই কি আমার সব হইল!

"স্বামীর তিরস্কার সহ্য হয়, কিন্তু স্বামীর ভালবাসাহীন যত্ন সহ্য হয় না; সে আরও যাতনার।

"স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিতে স্ত্রীর লজ্জা কি! তিনি আমার উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু অভিমান করিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া আমি কয় দিন থাকিতে পারি? আমাকে লইয়া যাইবার জন্য লিখিয়াছি। তাঁহার দেখা পাইলেও সে যাতনার অনেক উপশম হয়।

"মনের কষ্টে তোমাকে অনেক কথা লিখিলাম। আশা করি, ছেলে মেয়েরা সকলে ভাল আছে। তোমার সঙ্গে একবার দেখা করিতে বড় ইচ্ছা করে।

"তোমার ভগিনী

"শোভা।"

আমি দেখিলাম, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই সত্য; একটা বড় ভুল হইয়াছে। ভুলেই এত গোল। ভাবিলাম, এই ত রমণী; এই কোমলতা এই মাধুরী, রমণী কি ইহা ত্যাগ করিতে পারেন? রমণী কি পুরুষের মত কঠোর হইতে পারেন? পারিলে এ সংসার মরুময় হইত, পারিলে এ সংসার মানবের বাসের অনুপযোগী হইত।

৬

ইহার দুই দিন পরে আমি ভবেশের এক পত্র পাইলাম। ভবেশ লিখিয়াছে,—

"ভাই,—তোমার পত্র পাইয়াছি। জগতে যদি আর কিছুও না পাইয়া থাকি, তবু যে তোমার মত বন্ধু পাইয়াছি, ইহা আমার অল্প সুখের কথা নহে। কিন্তু তোমাদের কিছুই করিতে পারিলাম না। তোমাদের বন্ধুত্বের উপযুক্ত হইতে পারিলাম না। উপযুক্ত হইবার সম্বল আমার ছিল। তবে আজ আমার এ দুর্দ্দশা কেন?

"জানি না, কোন্ জন্মের কাহার কোন্ অভিশাপ এ জীবনে পত্নী-রূপে আমার অনুসরণ করিতেছে; আমার জীবন মরুময় করিতেছে; আমার সকল আশা, সকল কল্পনা নিষ্ফল করিতেছে। জীবনে অনেক কায করিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুই হইল না—কিছুই হইবে না।

"আমি বিবাহের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি। তুমি সত্যই লিখি-য়াছ, এক পত্নীতে যে অসুখ পাইয়াছি, অন্য পত্নীতে যে তাহাই পাইব না, এমন কথা কে বলিতে পারে? এখন কিছুদিন দেশ-ভ্রমণে বাহির হইব। লক্ষ্যহীন ভাবে দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে যাইব। দেখিব,সেই অস্থিরতায় যদি হৃদয়ের এ যাতনা ভুলিতে পারি। কবে ফিরিব, বলিতে পারি না; ফিরিব কি না, বলিতে পারি না। যাইবার পূর্ব্বে একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি কখন বাড়ীতে

থাক? হয় ত সেই শেষ সাক্ষাৎ হইবে। গৃহে যাহার কেবল যাতনা, তাহার কি আর গৃহে কোন আকর্ষণ থাকে? তাহার কি আর গৃহে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে? আমি কোথায় যাইব, তাহা স্থির নাই।

"তোমার পত্র পাইবার পর এত দিন পরে সহসা আমার পত্নীর এক পত্র পাইয়াছি। জানি না কেন, তিনি তাঁহার পিত্রালয় হইতে তাঁহাকে আমার গৃহে লইয়া আসিতে লিখিয়াছেন। হয় ত পিত্রালয়ে তাঁহার কোন অসুবিধা হইতেছে। যখন তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছি, তখন তাঁহার ভরণপোষণের ভার আমার; কাযেই তিনি ইচ্ছা করিলে আমি তাঁহার আগমনে বাধা দিতে চাহি না। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার আর দেখা না হওয়াই ভাল। যে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা নাই, ঘৃণা আছে, সে দম্পতীর পরস্পর সাক্ষাৎ যন্ত্রণামাত্র। সে যন্ত্রণা আমি ইচ্ছা করিয়া সহ্য করিব কেন? তিনি আসিবার পূর্ব্বেই আমি দেশভ্রমণে চলিয়া যাইব। আমি যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যাইব, তাহাতে তাঁহার কোনও অভাব হইবে না। আমার পত্নীকে এ কথা লিখিয়া দিলাম। তিনি যে দিন আসিতে চাহিবেন, সেই দিন তাঁহার আসিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি চলিয়া যাইব।

"কখন তোমার বাড়ী থাকা নিশ্চিত, তাহা লিখিবে,—তোমার সহিত দেখা করিব। আশা করি, তুমি ভাল আছ। ইতি।

"হতভাগ্য ভবেশ।"

পত্রখানি পড়িয়া আমি দেখিলাম—আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই বটে। ভবেশ নিতান্তই ক্ষণিক উত্তেজনায় বিবাহের সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাই আমার পত্র পড়িয়াই সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে। যে ভাল করিয়া ভাবিয়া কিছু স্থির করে, সে কি সহজে আপনার মতের পরিবর্ত্তন করে?

কিন্তু ভবেশ তাহার পত্নীকে যে পত্র লিখিয়াছে, তাহা আমার ভাল বলিয়া বোধ হইল না। কেন যে তিনি পিত্রালয় হইতে স্বামীর কাছে যাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমি আমার পত্নীর পত্রে জানিতে পারিয়াছিলাম। ভবেশ তাহা জানিত না; জানিলে তাহার মত পরিবর্ত্তিত হইত। একবার ভাবিলাম, এখনই গিয়া ভবেশকে সব কথা বলি; তাহাকে দিয়া শোভাকে আর একখানা পত্র লিখাইয়া পাঠাইয়া দিয়া আসি। হায়, তখন যদি তাহাই করিতাম! কিন্তু তখন ত ভাবি নাই, এত দূর হইবে; আর সে দিন আমার বাড়ীতে কিছু কায ছিল।

আজ ভাবি, সে দিন সব কায ফেলিয়া কেন যাই নাই, কেন ভবেশকে দিয়া শোভাকে আর একখানা পত্র লিখাইয়া দিয়া আসি নাই! সেদিন যে সুযোগ গিয়াছে, সে সুযোগ জীবনে আর আসিবে না; বুঝি সেরূপ সুযোগ জীবনে একবারমাত্র আইসে। একটা মানব-জীবন! আর এক জনের সর্ব্বনাশ! আমার না হয় কিছু অসুবিধা হইত, কেন সব কায ফেলিয়া যাই নাই! সে জন্য আমি এতদিন অনুতাপ করিয়াছি; যত দিন বাঁচিয়া থাকিব,

ততদিন অনুতাপ করিব। কিন্তু তখন ভাবি নাই, এত দূর হইবে।

৭

সে দিন যাইতে পারিলাম না। তাহার পর দিন অপরাহ্ণে ভবেশের চাকর আমার নামে একখানি পত্র লইয়া আসিল। পত্রপাঠ করিয়া আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। ভবেশ লিখিয়াছে,—

"ভাই, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার পত্র পাইয়া শোভা আত্মহত্যা করিয়াছে। তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহাই বটে। আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম, ভুল করিয়াছিলাম। যে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে না, সে স্ত্রী কি স্বামীর সামান্য উপেক্ষায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে? সহজে কি কেহ জীবন ত্যাগ করিতে চাহে? এ জীবন কে না ভালবাসে? তখন যদি একবার ভাবিয়া দেখিতাম, তখন যদি একবার তোমার কথা শুনিতাম!

"শোভা লিখিয়াছে—'তুমি আমাকে চরণে স্থান দিলে না; আমার অপরাধের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাহিবারও অবসর দিলে না;—আর এ প্রাণ রাখিব কিসের জন্য? আমি অপরাধ করিয়াছিলাম; তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার শিক্ষক, তুমি আমার দেবতা, তুমি আমায় ক্ষমা করিলে না। যে স্ত্রী স্বামীর ভালবাসা পায় না, স্বামীকে কেবল যাতনা দেয়, তাহার মরণই মঙ্গল। তুমি কি মনে কর, আমার ব্যবহারে তুমি ব্যথিত হইলে তোমার ম্লান মুখ দেখিয়া আমার কষ্ট হইত না? আমি কেমন করিয়া তোমাকে

বুঝাইব, আমি কি কষ্ট পাইয়াছি। দোষ আর কাহারও নহে,—দোষ আমার অদৃষ্টের, আর আমার। মরিবার সময় যদি একবার তোমাকে দেখিয়া মরিতে পারিতাম, যদি তোমার কাছে ক্ষমা চাহিয়া মরিতে পাইতাম! হায়! এ পোড়া অদৃষ্টে তাহাও হইল না।'

"তাহার পর শোভা লিখিয়াছে, 'তোমার কাছে ক্ষমা চাহিয়া মরিতে পারিলাম না, এই দুঃখ লইয়া মরিলাম। তোমার কাছে আমার শেষ প্রার্থনা, আমার অপরাধ ক্ষমা করিও; আর আশীর্ব্বাদ করিও,—এ জন্মে যাহা হইল না, পরজন্মে যেন তাহা হয়, পর জন্মে যেন তোমার মনের মত হইয়া তোমার ভালবাসা পাই।'

"আমিই আমার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ। আমি আত্মহত্যা করিব না; বাঁচিয়া সুদীর্ঘ জীবনে হৃদয়ে নরকযন্ত্রণা সহ্য করাই আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

"সমাজের পক্ষে আমি মৃত। আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না। যদি পার, মধ্যে মধ্যে এই হতভাগ্যের কথা স্মরণ করিও। ইতি।

"ভবেশ।"

কি দারুণ ভুল! পত্র পড়িয়া তাড়াতাড়ি ভবেশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। দ্বারে ভবেশের ভৃত্য জানাইল যে,-ভবেশ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবে না,—আমার সহিতও নহে।

কুলটা।

১

কুলটার কলঙ্কিত কাহিনী কে কবে সংগ্রহ করিয়া রাখে? যে আঘ্রাত কুসুম ঘটনাক্রমে পঙ্কিল প্রবাহে পড়িয়া কর্দ্দমকলুষিত কূলে উপনীত হয়, তাহার ইতিহাস কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে না। তাই সতীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে শারদা কি ছিল, কোথায় ছিল,—সে সকল কথা আমি বলিতে পারি না।

সতীশ আমার বাল্যকালের সহপাঠী। সেও অনেক দিনের কথা। তাহার পর যেমন হইয়া থাকে,—বাল্যবন্ধুরা কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ঘটনাক্রমে কখনও কোথাও সাক্ষাৎ হয়—হয় ত দু' চারিটি কথা হয়—নহে ত কেবল কুশল-প্রশ্নের আদানপ্রদানেই কথা শেষ হয়। সতীশের সঙ্গেও তেমনই কালে ভদ্রে দুই এক দিন সাক্ষাৎ হইয়াছে মাত্র। আমি তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত ছিলাম না।

শীতকাল। রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। আমি লেপ মুড়ি দিয়া অকাতরে অগাধ নিদ্রায় অভিভূত। এমন সময় 'ডাক-ঘণ্টা' বাজিয়া উঠিল। বুঝিলাম, কোন রোগীর জন্য ডাকিতে আসিয়াছে। নিম্নতলে বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিলাম, আমার সরকার এক জন

সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছে। আমাকে দেখিয়া সরকার বলিল, "আপনাকে একবার বাহিরে যাইতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সব কথা স্থির হইয়াছে ?"

সরকার আমাকে দর্শনীর বাবদ কয়খানি নোট দিল।

আমি বলিলাম, "গাড়ী আনিতে হইবে।"

আগন্তুক বলিল, "আমি আনিয়াছি।"

"কি রোগ ?"

"রোগিণীর নিশ্বাসরোধ হইতেছে। তিনি বহুক্ষণ মূর্চ্ছিতা।"

আমি কম্পাউণ্ডারকে ডাকাইয়া ব্যাগে কয়টি ঔষধ দিতে বলিলাম।

আমি পুনরায় শয়নকক্ষে গমন করিলাম। ডাক আসিয়াছে—বাহিরে যাইতেছি, এ কথা জাগরিতা গৃহিণীকে জানাইলাম ; তাহার পর যথেষ্ট গরম কাপড়ে আবৃত হইয়া রোগি-দর্শনে চলিলাম।

অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ী রোগীর গৃহদ্বারে উপনীত হইল। একটি ভৃত্য দ্বারের নিকট হাতলণ্ঠন জ্বালিয়া ঝিমাইতেছিল। সে আমাকে পথ দেখাইয়া দ্বিতলে একটি কামরায় লইয়া গেল। গৃহস্বামী রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন ; উঠিয়া আমার অভ্যর্থনা করিলেন। আমি দেখিলাম,—সতীশ। আমাকে দেখিয়া সতীশ যেন কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল ; তাহার কথা কেমন বাধ-বাধ বোধ হইল। কিন্তু তাহার সে সঙ্কোচ মুহূর্ত্তমধ্যেই অপনীত হইল। সে রোগিণীকে তাহার পত্নী বলিয়া পরিচয় দিল।

আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, রোগ মূর্চ্ছা। রোগিণীর মূর্চ্ছারোগ ছিল। শ্বাসরোধ—সম্ভবতঃ তাহারই এক রূপ। অধিকক্ষণ থাকিবার প্রয়োজন হইল না। ব্যবস্থার কথা বুঝাইয়া আমি গৃহে ফিরিলাম।

পথে ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম। সতীশ কলিকাতাবাসী; কিন্তু এ ত তাহার গৃহ নহে! গৃহে অন্য কোন পুরুষ আত্মীয়ের অদর্শনে ও রোগিণীর নিকট অন্য কোন স্ত্রীলোকের অভাবে আমার কেমন বোধ হইয়াছিল। তাই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম,—রোগিণীর সীমন্তে সধবার চিহ্ন সিন্দুরের রেখা নাই। আমি ভাবিলাম, ইহার অর্থ কি?

২

গৃহে আসিয়া গৃহিণীকে সন্দেহের কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি হাসিলেন, এবং আমার ও সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ জাতির বুদ্ধির উপর দোষারোপ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি সহজ উপায় ছাড়িয়াছি,—দীর্ঘকাল রোগশয্যায় থাকিলে প্রসাধনের অভাবে ও শয্যার ঘর্ষণে সিন্দুর চিহ্ন অস্পষ্ট হইয়া আসিতে পারে—দীপালোকে তাহা সহজে লক্ষিত হয় না। কিন্তু হিন্দুসধবার বাম হস্তের অলঙ্কার দক্ষিণ হস্তের অলঙ্কার অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হয়;—সধবার 'লোহ' স্ব-রূপেই হউক, বা স্বর্ণমণ্ডিতই হউক, সধবার বাম মণিবন্ধে বিরাজ করে।

সঙ্কেত জানিলাম। সঙ্কেত-ব্যবহারের সুযোগও ঘটিল। কয়

দিন পরে পূর্ব্বরোগের পুনরাবির্ভাবে আবার আমার ডাক পড়িল। দেখিলাম, রোগিণীর দুই মণিবন্ধে অলঙ্কারের সংখ্যা সমান। দেখিয়া দুঃখিত ও ব্যথিত হইলাম। সতীশের পদস্খলনে মনে বড় ব্যথা পাইলাম।

রোগিণীর চিকিৎসার জন্য আমাকে মধ্যে মধ্যে যাইতে হইত। ফলে সতীশের সহিত পূর্ব্বের ঘনিষ্ঠতা ক্রমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। সতীশ বুঝিতে পারিল, আমি প্রকৃত রহস্য জানিতে পারিয়াছি।

বলি বলি করিয়া একদিন আমি সতীশকে আমার বেদনার কথা বলিয়া ফেলিলাম। সতীশ আপনার সব কথা বলিয়া ফেলিল। শুনিয়া মনে হইল, সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে স্বীকার করিল, আমাকে দেখিলে সে বিব্রত হইত, পাছে আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করি—তাহা হইলে সে কি উত্তর দিবে,—ইত্যাদি। এখন আমাকে সব কথা বলিয়া সে যেন ভারমুক্ত হইল। দেখিলাম,—শারদার মোহে সে যেরূপ মত্ত, তাহাতে সহসা তাহাকে সে মোহ হইতে মুক্ত করা অসম্ভব। সতীশ আরও বলিল, তাহা হইলে শারদার কি হইবে—সে কি তাহাকে আশ্রয়চ্যুত করিয়া ভাসাইয়া দিবে? সে তাহা পারিবে না। সতীশের দোষের মধ্যে আমি তাহার এই সঙ্কল্পে সামান্য গুণ-পরিচয় পাইলাম।

৩

কয় মাস কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন সতীশের পত্নীর চিকিৎসার জন্য আমাকে সতীশের বাড়ীতে যাইতে হইল।

পঠদ্দশার পর সেই প্রথম সে বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। সতীশের পত্নীকে দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সতীশের পত্নী অসামান্য রূপে রূপবতী—যেন কবির কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। আবার প্রচ্ছন্ন বিষাদের ভাব সে সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে যে স্নিগ্ধ কোমলতার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাতে সে রূপরাশি যেন আরও চিত্তহারী হইয়াছিল;—তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, দীপ্ত-কর-দিবাকর-দ্যুতির অপেক্ষা স্নিগ্ধ-শশধর-কর কেন অধিক সুন্দর! সে বিষন্নতায় সতীশের পত্নীর সৌন্দর্য্যে দেবত্বের আভাস মিশিয়াছিল।

আমি দেখিলাম, সতীশের পত্নীর তুলনায় শারদা রূপগর্ব্বহীনা। অথচ সতীশ তাহারই জন্য পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছে,—কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইয়াছে! ভ্রমর কেন বিকশিত কমলবন ত্যাগ করিয়া সপ্তপর্ণে আকৃষ্ট হয়, তাহা কে বলিবে? শ্রীরাধা যখন বিরহবেদনায় ব্যথিতা—স্বর্ণপ্রতিমা যখন ধূলায় লুণ্ঠিতা, কুব্জা তখন শ্যামসোহাগিনী! ইহা অদৃষ্টের বিড়ম্বনা বটে।

সতীশের জননী আমার নিকট অনেক দুঃখ করিলেন। সতীশ তাঁহার একমাত্র সন্তান। বধূর ব্যবহারগুণে তিনি তাহাকে কন্যার মত স্নেহ করিতেন। তিনি আপনি দেখিয়া তাহাকে বধূ করিয়াছিলেন। এখন সে সতীশের ব্যবহারে মনঃকষ্টে শুকাইয়া যাইতেছে—তাহার দুঃখে ও পুত্রের ব্যবহারে জননীর হৃদয় অহরহঃ ব্যথিত হইতেছিল। সে কথা বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিতে লাগি-

লেন। তিনি যখন আমাকে এই দুঃখকাহিনী বলিতেছিলেন, তখন কক্ষের দ্বারান্তরালে কাহার দীর্ঘনিশ্বাসপতনের শব্দ শুনিতে পাইলাম।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু কি করিব? সতীশের ব্যাধি শিবের অসাধ্য। সে দিনের মধ্যে কেবল একবার গৃহে যাইত। প্রভাতে গৃহ হইয়া আফিসে যাইত। পত্নীর সহিত ক্বচিৎ তাহার সাক্ষাৎ হইত। আমি কি করিয়া তাহাকে ফিরাইব?

৪

এক বৎসর কাটিয়া গেল। বৎসরের মধ্যে সতীশের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিল না। ক্রমে তাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইতে লাগিলাম।

এই সময় এক দিন দেখিলাম, সতীশের মুখ অন্ধকার। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সতীশের জননী আসন্ন অর্দ্ধোদয় যোগে বারাণসীতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতে চাহেন। শুনিয়া আমি বলিলাম, "তাহার আর ভাবনা কি? আমার মাও যাইতে উৎসুক। এমন সঙ্গী পাইলে তাঁহারও যাওয়া ঘটিবে।" সতীশ কিন্তু সন্তুষ্ট হইল না।

প্রকৃত কথা এই যে, সতীশের জননী যেমন বারাণসী যাইতে উৎসুক হইয়াছিলেন—শারদাও যাইবার জন্য তেমনই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। কাযেই সতীশ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

সতীশ জননী ও শারদা উভয়কেই নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু সফল হইল না।

শেষে দাঁড়াইল এই যে, আমি আমার জননীর সঙ্গে সতীশের জননীকেও লইয়া যাইবার ভার লইলাম। সতীশ সরকার ও দাসী সঙ্গে দিয়া শারদাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল। সে স্বয়ং গেল না।

যাইবার দিন দেখিলাম, সতীশের জননীর সঙ্গে তাহার পত্নীও চলিয়াছে। তাহার যাইবার কথা পূর্ব্বে শুনি নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সতীশের জননী অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "কি করিব, বাবা? তুমি ত সবই জান। বৌমা কাঁদিতে লাগিল, বলিল, 'মা, জন্মান্তরের কর্ম্মফলে এ জন্মে এই দুর্গতি। এ জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিলে হয় ত জন্মান্তরে সুখী হইতে পারিব।' কাযেই আমি লইয়া যাইতে সম্মত হইলাম। নহিলে কি বৌমার তীর্থ-ধর্ম্ম করিবার বয়স?" তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আমারও চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। দেখিলাম, আমার মাও কাঁদিতেছেন।

কয়টি রমণী, কয় জন ভৃত্য ও কতকগুলি দ্রব্য লইয়া আমি বারাণসী যাত্রা করিলাম। বহুকষ্টে 'রিজার্ভ' কামরার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কাযেই যাত্রীর বিষম বাহুল্যেও কোনরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না। আমরা নিরাপদে বারাণসীতে আসিয়া উপনীত হইলাম।

৫

যোগের দিন প্রত্যূষে জনকোলাহলে নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিলাম, রাজপথ গঙ্গাস্নানার্থী ও গঙ্গাস্নানার্থিনীতে পূর্ণ। বর্ষার বারিপ্রবাহের মত জনস্রোতঃ অবিরাম বহিয়া যাইতেছে।

সে দৃশ্য দেখিয়া মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল—পুণ্যকামীদিগকে দেখিয়া মনে বিস্ময় ও ভক্তি সমুদিত হইল।

গঙ্গাতীরে আসিয়া সে ভাব সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী—কি আগ্রহে গঙ্গার পুণ্যপ্রবাহে অবগাহন করিয়া জন্ম সার্থক মনে করিতেছে! এ আগ্রহ যে অটল বিশ্বাসের ফল, সে বিশ্বাস মানুষকে দেবত্বের সন্নিহিত করে; এই বিশ্বাসের বলেই মানুষ সকল পার্থিব সম্পদই হেলায় পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল,—এ বিশ্বাস আমাদের অধিকৃত ছিল,—আর নূতন শিক্ষায় ও নূতন দীক্ষায় আমরা এই বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছি। ইহা উন্নতির চিহ্ন, না অবনতির নিদর্শন?

বহু চেষ্টায় কোনরূপে মা'কে, সতীশের জননীকে ও সতীশের পত্নীকে স্নান করাইয়া লইলাম। সে জনতায় গঙ্গায় অবগাহন যে কিরূপ দুষ্কর, তাহা যে না দেখিয়াছে, তাহাকে বুঝাইতে পারিব না। তাঁহারা তীরে ভিখারীদিগকে অর্থ দান করিলেন।

তাহার পর তাঁহাদিগকে লইয়া আমি গৃহে চলিলাম।

৬

গৃহে ফিরিবার সময় নদী হইতে অদূরে পথের উপর কয় জন লোক একত্রিত হইয়াছে দেখিয়া কৌতূহলবশে চাহিয়া দেখিলাম,—এক জন মরণাহতা রমণী পথে পড়িয়া আছে। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, কি সর্ব্বনাশ!—এ যে শারদা। বুঝিলাম, অভাগিনী বারাণসীতে আসিয়াছিল;—বিসূচিকায় আক্রান্তা হইয়াছে;—তাহার ভৃত্যবর্গ

তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে;—সে রাজপথে ধূলিশয়নে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে।

আমি বিষম দুশ্চিন্তায় পড়িলাম; কি করি? সতীশের জননীর— বিশেষতঃ তাহার পত্নীর নিকট এ কথা গোপন রাখিতে হইবে। কিন্তু শারদাকেই বা বিনা চিকিৎসায় কেমন করিয়া পথে মরিতে ফেলিয়া যাইব? শেষে ভাবিলাম, আমার সহযাত্রীদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিয়া শারদার যেরূপ হয় একটা ব্যবস্থা করিব।

তাহাই স্থির করিয়া আমি সতীশের জননীকে বলিলাম, "চলুন, গৃহে যাই। বেলা হইয়াছে।"

কিন্তু আমি যখন একরূপ ভাবিতেছিলাম, অদৃষ্ট তখন অন্যরূপ গড়িতেছিল। সতীশের পত্নী মরণাহতা রমণীকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে তাহার শাশুড়ীকে বলিল, "মা, ঐ দেখ, কে পথে পড়িয়া মরিতেছে। চল, উহাকে গৃহে লইয়া যাই।" শুনিয়া আমি বলিলাম, "উহার আর বাঁচিবার আশা নাই। বৃথা উহাকে লইয়া গিয়া কি হইবে?" সতীশের পত্নী আবার তাহার শাশুড়ীকে বলিল, "না, মা! তীর্থে আসিয়া যদি সেবা করিয়া উহাকে বাঁচাইতে পারি— তবে তীর্থদর্শন সার্থক হইবে।"

আমি বিপদে পড়িলাম। কি করি? শেষে বলিলাম, "আপনাদের গৃহে রাখিয়া আসিয়া আমি উহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিব। এখন গৃহে চলুন।" ততক্ষণে সতীশের পত্নীর দয়া তাহার সহযাত্রিণী রমণীগণের হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়াছে। আমার মা

বলিলেন, "ততক্ষণ বাঁচিবে কি?" আমি বলিলাম, "তবে কি করিব?" সতীশের পত্নী আমার জননীকে কি বলিল, আমার মা বলিলেন, "বৌমা যাহা বলিতেছে, না হয় তাহাই কর। উহাকে সঙ্গে লইয়া চল।"

আমি আপত্তি করিলাম। বিদেশে বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীকে লইয়া বিপন্ন হইতে হইবে। তাহার সেবা-শুশ্রূষার কি হইবে?

কিন্তু তখন তিনটি রমণীহৃদয়ে দয়া-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। সে প্রবাহে আমার যুক্তি-তর্ক সব ভাসিয়া গেল। তিন জনের অনুরোধ আমি অবহেলা করিতে পারিলাম না; অগত্যা লোক সংগ্রহ করিয়া সংজ্ঞাশূন্যা শারদাকে গৃহে লইয়া চলিলাম।

আমি ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম,—না জানি কি হইবে? যদি শারদাকে মৃত্যুর মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া সতীশের পত্নী তাহার পরিচয় পায়? তখন সে হৃদয়ে কি বিষম বেদনা পাইবে? আবার শারদা যখন জানিতে পারিবে, সে তাহার জীবনদাত্রীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে, তখন সেই বা কি ভাবিবে?

আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু আশঙ্কায় হৃদয় চঞ্চল হইয়া রহিল। না জানি কি ঘটিবে?

৭

গৃহে শারদার সেবাশুশ্রূষার ত্রুটী হইল না। সতীশের পত্নী যে ভাবে তাহার সেবা করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আমি—চিকিৎসা-ব্যবসায়ী আমিও বিস্মিত হইলাম।

রোগিণীর অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতে লাগিল।

সুখের বিষয়, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন শারদার জ্ঞানসঞ্চার হইল, তখন সে কক্ষে আমি ব্যতীত আর কেহ ছিল না। শারদা আমাকে দেখিয়া কিছুক্ষণ বিস্ময়ে কথা কহিতে পারিল না;—তাহার পর বলিল, "এ কি? আপনি?"

আমি দেখিলাম, সকল কথা বলিলে দুর্ব্বলদেহা শারদার বিপদের বিশেষ আশঙ্কা বিদ্যমান। তাই কেবল বলিলাম, "সব পরে বুঝাইয়া বলিব। সাবধান, তুমি যে আমাকে চিন, তাহা প্রকাশ করিও না।"

শারদা আরও বিস্মিতা হইল।

দুই দিন কাটিয়া গেল। শারদার রোগমুক্তিতে সতীশের পত্নীর আনন্দ যেন আর ধরে না।

শারদা তাহার শুশ্রূষায় ক্রমেই কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল। শেষে তৃতীয় দিন সে সতীশের পত্নীকে বলিল, "আপনি ভগিনীর অধিক যত্নে ও স্নেহে এ অভাগিনীর শুশ্রূষা করিতেছেন। কিন্তু আমার পরিচয় পাইলে আপনি আমাকে কেবল ঘৃণা করিবেন।"

সতীশের পত্নী বলিল, "না। ঘৃণা করিব কেন?"

শারদা স্থিরভাবে বলিল, "আমি গৃহস্থের পবিত্র গৃহ কলুষিত করিয়াছি। আমি—কুলটা।"

সতীশের পত্নী মুহূর্ত্তমাত্র বিস্ময়ে মূক হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কুলটাকে ঘৃণা করিবার অধিকার আমার নাই।"

শারদার নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "সে—কি ?"

সতীশের পত্নী উত্তর করিল, "আমার স্বামী আমার সে অধিকার আর রাখেন নাই। স্বামী যাহাকে জীবন-সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেন,— পত্নীর তাহাকে ঘৃণা করিবার অধিকার নাই।" কথাটা বলিতে বলিতে সতীশের পত্নীর গলাটা ধরিয়া আসিল। তাহার পর সে উঠিয়া চলিয়া গেল। এমন অবস্থায় কোন্ পতিপ্রেমবঞ্চিতা মর্ম্ম-বেদনা-মথিত অশ্রু সংবরণ করিতে পারে ?

সেই দিন আমি শারদাকে সকল কথা বলিলাম। শুনিয়া শারদার রোগশীর্ণ আনন রক্তলেশশূন্য হইয়া গেল। সে কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কাতরভাবে আমাকে বলিল, "আপনি সব জানিয়া কেন আমাকে এখানে আনিলেন ?"

আমি বলিলাম, "আমি ত বলিয়াছি, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আমি তোমাকে এখানে আনিয়াছি।"

শারদা আর কিছু বলিল না ;—ভাবিতে লাগিল।

আমি অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। মা'র ও সতীশের মা'র মত হইল না। তিন দিন পরে আর একটি 'যোগ' ছিল ; তাঁহারা বলিলেন, সেই 'যোগে' স্নান করিয়া ফিরিবেন। সতীশের পত্নীও সেই মত করিল। বুঝিলাম,—তাহার কারণ— আরও তিন দিনে শারদা সম্পূর্ণ সুস্থ ও কিছু সবল হইতে পারিবে।

৮

আমরা যে দিন কলিকাতা যাত্রা করিব, সেই দিন প্রত্যূষে পরিচিত কণ্ঠের কলরবে নিদ্রাভঙ্গ হইল। কি হইয়াছে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলাম। মা, সতীশের জননী ও সতীশের পত্নী দাসীকে তিরস্কার করিতেছেন। মা বলিলেন, "তুমি কি বলিয়া তাহাকে যাইতে দিলে? দুর্ব্বল শরীরে এই শীতে প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান কি সহ্য হইবে?" দাসী বলিল, "আমি কি করিব? তিনি জিদ করিয়া বাহির হইলেন; সঙ্গে যাইতে চাহিলাম—নিষেধ করিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, শারদা গঙ্গাস্নান করিবার জন্য বাহির হইয়া গিয়াছে! "আর বকাবকি করিয়া কি হইবে? আমি যাই, দেখিয়া আসি"—বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

অদূরে গঙ্গা। নিকটবর্ত্তী ঘাটগুলিতে ঘুরিলাম, শারদা নাই। তখন আমার সন্দেহ হইতে লাগিল, হয় ত সে কোথাও চলিয়া গিয়াছে। অজ্ঞাত আশঙ্কা আমার হৃদয় পীড়িত করিতে লাগিল।

শেষে সন্ধানে সফল না হইয়া আমি গৃহে ফিরিলাম। শারদার কক্ষে যাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার উপাধানতলে দুইখানি পত্র পাইলাম; একখানি সতীশের পত্নীকে, অপরখানি সতীশকে লিখিত।

সতীশের পত্নীকে শারদা লিখিয়াছে:—"যে অভাগিনী আপনার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছিল—আপনি তাহাকেই জীবন দান করিয়াছেন। এ কথা ভাবিয়া আমি ঘৃণায়, লজ্জায়, অনুতাপে

দগ্ধ হইতেছি, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। মৃত্যু ব্যতীত আমি সে শান্তি পাইব না। আমি তাহারই সন্ধানে চলিলাম। জীবনই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়—আপনি আমাকে তাহাই দান করিয়াছেন। আর আমি কি তাহার প্রতিদানে আপনাকে আপনার অধিকার ফিরাইয়া দিতে পারিব না? আমিও রমণী! আপনি সতী। আপনাকে পতিপ্রেম হইতে কেহ চিরবঞ্চিতা রাখিতে পারিবে না। আপনার অগ্নিপরীক্ষা-পূত প্রেম আজ জয়ী হইয়াছে। আপনি পুণ্যবতী—আপনার আশীর্ব্বাদ সফল হইবে। তাই আজ আপনার নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি—যেন জন্মান্তরে আর কাহাকেও এমন মনোবেদনা দিবার দুর্ভাগ্য আমার না ঘটে। আমার অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে সতীশের স্ত্রীর নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। রমণীর পূত দয়াপ্রবাহে শারদার অপরাধ বিধৌত হইয়া গেল। তাহার প্রার্থনা সফল হইল।

শারদা সতীশকে লিখিয়াছে,—"আমার অদৃষ্ট এত দিনে আমাকে আমার জীবন-পথের শেষ দেখাইয়াছে। তুমি আমাকে অযাচিতভাবে অপ্রত্যাশিত সুখে সুখী করিয়াছ; আজ আমি তোমার সুখের পথ হইতে সরিয়া তোমার পক্ষে সে পথ মুক্ত করিতে যাইতেছি। তুমি ডাক্তার বাবুর নিকট সকল কথা শুনিতে পাইবে। তুমি কেমন করিয়া আমার মায়ায় অভিভূত হইয়া,

আমি যাঁহার চরণরেণু স্পর্শ করিবারও উপযুক্ত নহি, তাঁহাকে ভুলিয়াছিলে? অমৃতের উৎস ত্যাগ করিয়া তুমি তাপতপ্ত মরু-ভূমিতে বিচরণ করিয়াছ। আজ আমি স্বহস্তে সে মায়াজাল ছিন্ন করিয়া দিতেছি। প্রকৃত প্রেম মানুষকে কখনও ভ্রান্ত করিতে পারে না; পরন্তু তাহার তুল্য ভ্রান্তিভেষজ আর নাই। সে প্রেম উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত ও যৌবনাবেগ প্রশমিত করে; প্রেমা-স্পদকে ধ্বংসের প্রশস্ত ও সুগম পথ হইতে উন্নতির সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম পথে ফিরাইয়া আনে। সে প্রেমে যাহার উদ্ধার সংসাধিত না হয়, তাহার আর উদ্ধারের আশা নাই। আজ সেই প্রেম তোমাকে ভ্রান্তি হইতে মুক্তি দিতেছে। সেই প্রেমে তুমি সুখী হইবে। তোমার নিকট আমি শত অপরাধে অপরাধী। আমার সে সকল অপরাধ ক্ষমা করিও।"

আমরা সেই দিন কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

* * * * * * *

শারদার কথাই সত্য হইল। শারদার অন্তর্ধান সতীশের পক্ষে বিষম বেদনার কারণ হইল; কিন্তু পত্নীর প্রেমে সে বেদনা অপনীত হইল। পত্নীর প্রেম তাহাকে প্রকৃত সুখে সুখী করিল।

আমি সতীশকে কখনও শারদার কোনও কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতাম, শারদার সমুজ্জ্বল আত্ম-দান তাহাকে নারী-হৃদয়ের এক অদৃষ্টপূর্ব্ব মহত্ত্ব দেখাইয়াছে। সে তাহা ভুলিতে পারে নাই।

আমিও তাহা ভুলিতে পারি নাই। সেই আত্মত্যাগে তাহার কলঙ্ককলুষিত জীবনের সকল কালিমা প্রক্ষালিত হইয়াছিল;—শুভ্র, সুন্দর নারীহৃদয়ের মহত্ত্ব সপ্রকাশ হইয়াছিল। মৃত্যুর আলোকে তাহার জীবনের তমোরাশি বিদূরিত হইয়াছিল—সেই আলোকে পুণ্যপূত রমণীহৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সম্পূর্ণ।